পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চ্যাটার্জি
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি সুকমল ঘোষ

খেয়া Online

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯

Issue: 2024Q201 | **Date**: 15-Jun-2024

email: jbi.alumni.1914@gmail.com
Website: www.jagadbandhualumni.com/KheyaLive
রেজি নং S/7337 under WB Act XXVI of 1961

বিষয় ভাবনা - পরিবেশ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

নিবন্ধ

দূষণ বাড়ছে, মনের অসুখও - ড. অমিত চক্রবর্তী ৪

সিওল এর ফিনিক্স 'চিয়ং গাই চিয়ন' - সন্দীপ চক্রবর্তী ৬

আমাদের সেই পরিবেশ থেকে এখন যেমন - দেবপ্রসন্ন সিংহ ৯

গজাননবাবুর পরিবেশচর্চা (রম্য রচনা) - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ১৩

সুন্দরবনের অজানা কথা - কৌশিক ত্রিপাঠী ১৬

ক্রিকেটের এক ডজন মজার ঘটনা - ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯

অথ বৃক কথা – রাজ ঘোষ ২২

কবিতা

সহর থেকে শহর - শৌভিক গাঙ্গুলী ২৭

প্রকৃতির বহর - তুষার চক্রবর্তী ২৮

মেঘের আঁচল - দীপাঞ্জন বসু ২৮

আমার ব্যাচ - ভাস্কর গুপ্ত ২৯

আমাদের খবরাখবর ৩১

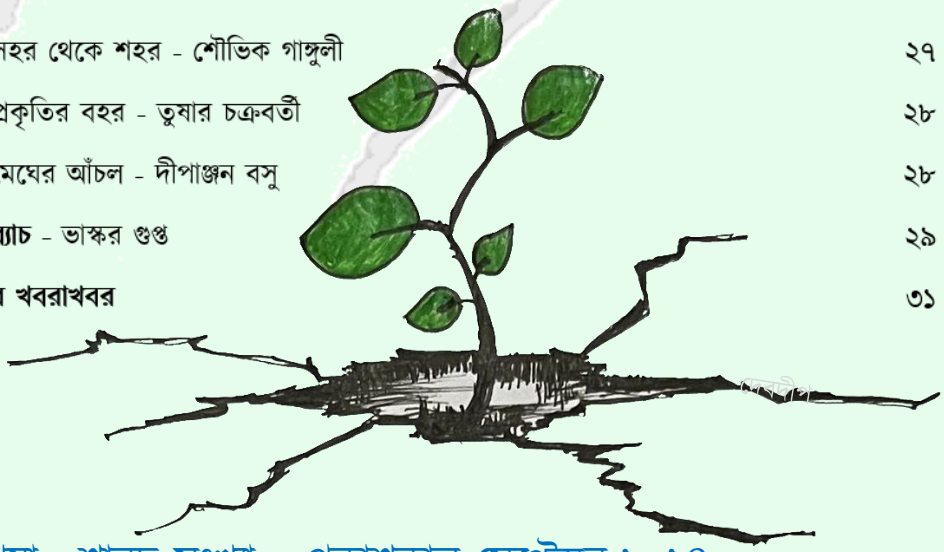

পরের খেয়া : শারদ সংখ্যা । প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০২৪

সম্পাদকীয়

জগৎ পারাবারের তীরে চিরকালের দেয়া নেয়া
আগামীর দিকে ভেসে চলে জগদ্বন্ধুর খেয়া

অনেকদিন বন্ধ থাকার পর আবার চালু হল খেয়া। বন্ধ থাকার দায় ছিল আমাদের আর আবার চালু করার কৃতিত্ব অগণিত পাঠক সদস্যদের। ধন্যবাদ জানাই সেইসব প্রাক্তনীদের যারা খেয়া প্রকাশ করার জন্য ক্রমাগত তাগাদা দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন, আবদার করেছেন এমনকি অভিমান ও অনুযোগও।

কিছুটা নতুন ছাঁদে ভিন্ন সাজে এল খেয়া। এখন থেকে ত্রৈমাসিক এবং প্রতি সংখ্যায় থাকবে কোনও না কোনও প্রচ্ছদ-ভাবনা। এবারের বিষয় হল পরিবেশ।

বিষয় ভাবনার পাশাপাশি সাধারণ মৌলিক লেখাও ঠাঁই পাবে অবশ্যই। ডাকে পাঠানোর সমস্যার কারণে আপাতত অনলাইন ঘরানাকেই বেছে নেওয়া হল খেয়া প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ নিয়ে লেখা এবারের খেয়ায় যা প্রকাশিত হয়েছে তা আমদের আশাতীত। এই সব গুরুগম্ভীর এবং অবশ্যই উচ্চমানের কিন্তু সুখপাঠ্য লেখা আপনারা পড়বেন, পড়ে ঋদ্ধ হবেন এবং মতামত জানাবেন আশা রাখি।

চারিদিকে এত হইচই
কিন্তু গাছ লাগানোর সময় কই?

একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিবেশ নিয়ে আমরা কতটা সচেতন? আদৌ কি এ নিয়ে কিছু ভাবি বা করি? কতটাই বা জানি এ বিষয়ে? আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই জীবনযুদ্ধে লড়াই করেই পেরে উঠি না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কতটুকুই বা সময় পাই সারাদিনে! তার মধ্যে আবার গাছ লাগাতে হবে...সে গাছের যত্ন নিতে হবে, জল দাও সার দাও! বলা সোজা কিন্তু করা কঠিন। ঠিক, একদম সত্যি কথা। এ সব দরকার নেই, বরং তার চেয়ে অনেক সহজ হল বাজারে যাওয়ার সময় একটা থলে বা ব্যাগ নিয়ে যাওয়া। থলে ভর্তি করে বাজার করার মজাই আলাদা আর এর ফলে অজান্তেই পরিবেশের অনেকটা উপকার হল। প্লাস্টিক প্যাকেট লাগল না ফলে ব্যবহৃত প্লাস্টিক যা প্রায় অক্ষয় হয়ে থেকে যায় এবং নদী নালা নর্দমা আটকে দেয় সেই ক্ষতি খানিকটা কম হল। আর ভারী থলে নিয়ে হাঁটার ফলে শরীরের উপকার।

এ জীবনে কিছুই অবিনশ্বর নয়
একমাত্র প্লাস্টিকের নেই কোনও ক্ষয়

আমরা জানি, জলই জীবন। জল খাওয়ার জন্য আজকাল প্রায় সবাই বাড়িতে প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করি। ফ্রিজে বা বাইরে জল রাখার জন্য। কাচের বোতল কিন্তু বেশি দাম নয়। টেকেও অনেকদিন। আরও ভালো হয় যদি মাটির কলসি ব্যবহার করা যায়। এতে জল ঠান্ডা থাকে। খেতেও ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, প্লাস্টিকের ব্যবহার এবং প্লাস্টিক বর্জ্যজনিত দূষণ কম হয়। সারাদিনে বারবার জল খাওয়ার জন্য হেঁটে গিয়ে নিচু হয়ে জল নিতে হয় বলে কিছুটা শারীরিক পরিশ্রমও হয়।

মাটির কলসি মাটির বোতলে জল
গরমকালে দারুণ আরাম শরীর-মন শীতল

আমরা যারা শহরে থাকি তাদের বেশিরভাগই চাকরি করি। অফিসে যাওয়ার জন্য আজকাল নিজস্ব গাড়ি বা মোটরসাইকেলের ব্যবহার বেড়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতে এটাকে একটা উন্নতির সূচক হিসেবে ধরা হয়। কোন শহরে কত গাড়ি বিক্রি বা কত গাড়ি চলে ইত্যাদি আলোচনা আমরা প্রায়ই শুনি। পেট্রোল চালিত গাড়ি থেকে নির্গত গ্যাস পরিবেশ দূষণের এক অন্যতম প্রধান উপাদান। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন যদি নিজের গাড়ি চড়ে যাতায়াত করে তাহলে পরিবেশে মোট যে পরিমাণ গ্যাস বা দূষণ সৃষ্টি হয় তার বদলে গণ পরিবহণ অর্থাৎ বাসে চড়ে গেলে দূষণ অনেকটা কমে। অফিস ছাড়া অল্প দূরত্বে গাড়ি বা মোটর সাইকেলের বদলে সাধারণ বাইসাইকেল বা হাঁটার অভ্যাস শরীর ও পরিবেশ দুটোকেই সুস্থ রাখে।

গাড়ির ধোঁয়া এসির গ্যাসে দূষণ বাড়ছে বেশি
ঘামলে শরীর সুস্থ থাকে হাঁটলে মাংসপেশি

এই ভাবে প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাস একটু বদল করে নিতে পারলেই আমরা পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে বেশ কিছুটা রক্ষা করতে পারি। এগুলো নিতান্তই সাধারণ ও সহজ পথ, পরিবেশ রক্ষা করার। এ ছাড়া এ বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা, তাঁদের কেউ পরিবেশ-কর্মী কেউ পরিবেশ চিন্তক। আপনারা পড়বেন, তারপর আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন যার ভিত্তিতে আমরা খেয়াকে আরও মনোজ্ঞ ও সুন্দর করে তুলতে পারি। সুস্থ পরিবেশে সুস্থ চিন্তার ধারক ও বাহক হয়ে উঠুক আমাদের খেয়া — খেয়ার পরবর্তী সংখ্যা হবে শারদ সংখ্যা। শারদ সংখ্যা অনলাইন নয়, মুদ্রিত সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। প্রত্যেক সদস্যের পড়ার টেবিলে বা মাথার বালিশের পাশে সাদরে ঠাঁই পাবে এ আমাদের বিশ্বাস।

ফেলে রেখে মোট মোটা বই
আগেভাগে খেয়া পড়বই

দূষণ বাড়ছে, মনের অসুখও

ড. অমিত চক্রবর্তী

শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের উপরেও যে পরিবেশের প্রভাব পড়ে সেটা নতুন কিছু নয়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় মনের ভাব পালটায়, আবেগ কমে বাড়ে। অবসাদে ভোগেন যারা তাদের অনেকের কাছেই রাতের তুলনায় সকাল অথবা দিনটা দুর্বিষহ লাগে। চাঁদনি রাতে মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে; মানসিক রোগগ্রস্তদের এখনও 'লুন্যাটিক' বলার রেওয়াজ আছে। শব্দটার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'চন্দ্রাহত'। পুর্ণ-চাঁদের আকর্ষণ আমাদের রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দনের গতি বাড়াতে সাহায্য করে, বিপাক ক্রিয়ার হার বাড়ায়, রক্তক্ষরণ ও মৃগীজনিত ফিট-এর সম্ভাবনাও বাড়ায়। অনেক বছর আগে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ এই পনেরো বছরে খুন-জখমের একটা বড় অংশ ঘটেছিল এই পূর্ণিমার রাতে।

এবার আসি পরিবেশ-দূষণের কথায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৬ সালে এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিলেন, প্রতি বছরে বাতাস দূষণের কারণে মৃত্যু হয় ৩০ লক্ষের বেশি মানুষের। বাতাসকে যা দূষিত করে তার মধ্যে থাকে কার্বন-মনো-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইডের মতো গ্যাস, সিসা এবং অন্যান্য ধাতুর যৌগ, নানা ধরনের হাইড্রোকার্বন এবং ভাসমান বিষাক্ত ধূলিকণা। আমাদের শরীরে এই ধূলিকণার কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত বলি, আমাদের কলকাতা শহরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, পৃথিবীর সবকটা বড় শহরের মধ্যে কলকাতার অবস্থান এ ব্যাপারে একদম প্রথম দিকে।

দূষিত ধূলিকণার কারণে হার্ট ও লাঙের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। আমাদের এখানে হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত অসুখ-বিসুখে ভোগার কারণ এই বিষাক্ত ধুলো। এতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় শিশু এবং বয়স্করা। এর কারণে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যেরও যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে তা প্রমাণিত হয়েছে গত এক দশকের গবেষণায়।
শহরের বাতাসে মিশে থাকা বিষ ক্ষতি করে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের। এতে শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সিসার মতো বিষাক্ত ধাতু গর্ভস্থ এবং সদ্যোজাত শিশুর শরীরে বেশি পরিমাণে গেলে বুদ্ধির বিকাশ যে ব্যাহত হয় সেটা এখন থেকে বহু বছর আগেই জেনেছিলেন বিজ্ঞানীরা। শহরাঞ্চলে বয়স্কদের মধ্যে 'ডিমেনশিয়া' বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে এখন বায়ুদূষণকেও দায়ী করা হচ্ছে। দূষিত পরিবেশে থাকতে যারা বাধ্য হচ্ছেন তাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা এবং অবসাদের ঘটনাও সম্ভবত বেশি ঘটছে।

জীবজন্তু ও মানুষকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় দেখা গেছে, বাতাসের বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভাসমান ধূলিকণার প্রভাবে যে 'অক্সিডেন্ট স্ট্রেস তৈরি হয় তার কারণে শরীরের স্বাভাবিক স্ট্রেস-হরমোন যার নাম 'কর্টিসল — তার নিঃসরণ

এবং কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যায়। এর ফলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি এবং অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কাজকর্ম ব্যাহত হয়। উৎকণ্ঠা এবং আবেগজনিত নানা উপসর্গের কারণ সম্ভবত এটাই। মানুষের মধ্যে যে রাগ ও অস্থিরতা বাড়ছে, ধৈর্য কমছে, মানুষ যে অন্যদের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, অবসাদের শিকার হচ্ছে — তার পিছনে জনবিস্ফোরণ, আর্থসামাজিক বিষয়, প্রতিযোগিতায় ইঁদুর-দৌড়ের পাশাপাশি দূষিত পরিবেশকেও যে দায়ী করা হচ্ছে তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কোনও সংশয় নেই আজ।

সিওল এর ফিনিক্স 'চিয়ং গাই চিয়ন'

সন্দীপ চক্রবর্তী

স্মরণাতীতকাল থেকেই যে কোনও সভ্যতার বিস্তারের পিছনে নদীর ভূমিকা অপরিহার্য। গুহাবাসী মানুষ যখন গৃহবাসী হল, চাষ আবাদ শিখল, তখন নদীর সন্নিকটে গড়ে উঠল জনপদ। তারপর কালের সারণী ধরে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, নদীর জল বয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। নদীর গুরুত্বের কথা মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীই উপলব্ধি করেছে। তাই নদীকে মাতৃসমা বলে উল্লেখ করা হয়েছে শাস্ত্রাদিতে।

শিল্পবিপ্লব ও উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ গোটা বিশ্বজুড়েই নদীর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়তে লাগল। শুধু জলপথে পরিবহন ও খাদ্যপানীয় নয়, নদী ব্যবহৃত হতে লাগল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বর্জ্য নিক্ষেপের কাজে।

একের পরে এক বাঁধ দেবার ফলে নদীর জলধারা তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে নাব্যতা হ্রাস পেল, সেই সাথে কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক মিশে দূষণ চরম আকার ধারণ করল। যত কলকারখানা, নগর বাড়তে থাকল, কমবেশি সব দেশেই এই পরিস্থিতি দেখা দিল।
এরপর এল একের পর এক বিশ্বযুদ্ধ। মানব সভ্যতার কুৎসিত রূপ প্রকট হতে থাকল। মানুষের জীবনহানির সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ এর উপর নেমে এল ভয়ঙ্কর আঘাত। বিভিন্ন যুদ্ধের পরিণতিতে আক্রান্ত দেশের বন, জঙ্গল, নদী ক্রমশ সমরাস্ত্রের আবর্জনার স্তূপ হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে দাঁড়াল!

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যত বেশি আমাদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, তত আমরা উপলব্ধি করছি যে জল-জঙ্গল-পাহাড় যদি বিপন্ন হয়, তাহলে কোন অর্থনৈতিক উন্নতিই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না।

রাষ্ট্রসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে যাতে ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের হাত থেকে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করা যায়। এই ক্ষতি এমন এক জায়গায় চলে যাচ্ছে যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব হবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বেড়ে উঠবে ভারসাম্যহীন এক দুনিয়ায় যেখানে নানারকম অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে।
একদিকে অর্থনৈতিক লক্ষ্যপূরণের তাগিদে বিরামহীনভাবে monetisation of natural resources ঘটে চলেছে, অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছাচার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সোনার ডিম পাড়া হাঁসের করুণ পরিণতি। এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মাঝে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্প আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা হাতে নিয়েছেন যাতে দেশের জলসম্পদের বিনাশ রোধ করা যায়। এগুলো বহু সমস্যার ভিতর ক্ষীণ আশার আলো দেখালেও বাস্তব

পরিস্থিতির তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে নদী সংস্কারের উদ্যোগ অনেক সময়ই পরিণত হচ্ছে কেবলমাত্র সৌন্দর্যকরণ কর্মসূচিতে। আদতে এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। একদিকে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন ঠিকাদার এর পকেটে যাচ্ছে এবং জনগণ মনে করছেন যে নদীর পুনর্জীবন লাভ হতে চলেছে। অপর দিকে আসলে যা হচ্ছে তা হল নদীর দুপাশ কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে সেখানে বাণিজ্যিক কাঠামো। এই concretisation এর অর্থ হল, নদীতীরের বাস্তুতন্ত্র (riparian ecology)-কে ধ্বংস করে ফেলা। এর ফলে যেমন ভূগর্ভস্থ জল recharge এর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তেমন গাছের শিকড়ের ভূমিক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া মাটিতে বসবাসকারী জীবজগৎ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে শুধু যে বন্যার প্রকোপ দেখা দেয় তাই নয়, পরিবেশের উপর এর সামগ্রিক ফল ভয়াবহ। এর মধ্যেও যে প্রকল্পগুলো কিছুটা ফলপ্রসু হচ্ছে, সেগুলি দীর্ঘসূত্রিতা ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সংঘাতের শিকার হচ্ছে।

BEFORE

AFTER

তবে সবটাই যে হতাশা এমনটা নয়। চারিদিকে চোখ রাখলে সাফল্যের সোনালি রেখা দেখা যায়। বিশ্বের একপ্রান্তের একদেশের সাফল্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে অন্য আর এক দেশের কোন উদ্যোগকে। কারণ একটিই গ্রহ আমাদের সবার বাসস্থান। তাই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো একই সূত্রে গাঁথা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল এর একটি সফল প্রজেক্টের কথা। সিওল শহরকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করেছে শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া Haan River. এই মূল নদীর থেকে ছোট ছোট জলধারা শহরের বিভিন্ন এলাকার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এরকম একটি stream এর নাম Cheong Gye Cheon. সিওল শহরের মাঝামাঝি স্থানে পশ্চিম থেকে পুব মুখে বয়ে চলেছে এই stream. প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই জলধারা শহরের মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে থেকে। Josesn Dynasty-র সময় থেকেই Cheong Gye Cheon জলধারা সিওল নগরীর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এরপর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে আমূল সংস্কার করা হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ এই জলধারাটির।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পরে কোরিয়ান পেনিনসুলা নানারকম সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধ, জাপানের আক্রমণ, কোরিয়ান যুদ্ধ — একের পর এক আছড়ে পড়েছে রাজধানী সিওলের ওপর। দলে দলে শরণার্থীর ভিড় এসে মাথাগোঁজার ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত Cheong Gye Cheon এর দুপারে। এক সময় যে নদী ছিল স্বচ্ছসলিলা, তা ক্রমে পরিণত হয়ে গেল পূতিগন্ধময় আবর্জনায়।
বিশেষ করে জাপানি আক্রমণের পরে অব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল এই নদীকে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরে কংক্রিট দিয়ে এই দূষিত নালা ঢেকে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু

হয়ে গেল। অবশেষে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে Cheong Gye Cheon-কে চাপা দিয়ে তৈরি হল এক elevated corridor highway. যে জলপথ যুগ যুগ ধরে ছিল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক, তা হারিয়ে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে! বুকের ওপর হাইওয়ের বোঝা চাপিয়ে শুয়ে রইল Cheong Gye Cheon.

একবিংশ শতাব্দী শুরু হল নতুন শপথ নিয়ে। এই সময় পরিবেশ সচেতন কিছু মানুষ এগিয়ে এলেন ৬০০ বছরেরও পুরোনো এই রাজধানীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য। এর অংশ হিসাবে ২০০৩ সালে শুরু হল Cheong Gye Cheon এর দুপারের ঘিঞ্জি দোকানপাট পুনর্বাসনের কাজ। যানজটে জর্জরিত রাস্তার বিকল্প খুঁজে বের করার পর, সরিয়ে দেওয়া হল elevated highway. বহু বছর চাপা পড়ে থাকা নদী বুক ভরে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিল। ধীরে ধীরে আগের রূপ ফিরে পেল Cheong Gye Cheon. আজ এই এলাকা সিওলের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান।

পুনর্জীবন লাভ করা এই জলধারা গোটা কোরিয়ান জাতির শিল্প সংস্কৃতি বোধের প্রতীক হয়ে বিরাজমান। এই প্রজেক্ট প্রমাণ করে দিয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে কঠিন চ্যালেঞ্জ জয় করেও সরকারের সংস্কার কর্মসূচি সফল হতে পারে। হাজার হাজার মানুষের পুনর্বাসন, হাইওয়ে সরিয়ে দিয়ে বিকল্প পথের সন্ধান করা - এসব সিদ্ধান্ত খুব সহজে কোনও দেশেরই ভুক্তভোগীরা মেনে নেন না। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় পদে পদে। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকে, তাহলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়।

আজ Cheong Gye Cheon এর দুই তীর অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। সারাবছর ধরে নানারকম আন্তর্জাতিক উৎসব হয়ে চলেছে। খোলা আকাশের নীচে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে থরে থরে সাজানো নানা বিষয়ের বই! শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষ নিজের মনে যখন খুশি এসে বই পড়ছে জলের ধারে বসে। জলে চড়ে বেড়াচ্ছে হাঁসের দল, মাছের ঝাঁক! রংবেরঙের ফুল দিয়ে সাজানো দুই পার দেখে মনে বিশ্বাস জাগে, যে প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েও উন্নয়ন সম্ভব!

বিভিন্ন দেশে আজ যেখানে নদী নালা বুজিয়ে একের পর এক নির্মাণকার্য হয়ে চলেছে, সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল এর মত সদাব্যস্ত একটি শহর যদি এই উলটপূরাণ করে দেখাতে পারে, তাহলে অন্যান্য শহরেও sustainable development সম্ভব, এই বিশ্বাস রাখা যায়!

তথ্য সংগ্রহ : লেখকের সিওল যাত্রা, মে-২০২৪

আমাদের সেই পরিবেশ থেকে এখন যেমন

দেবপ্রসন্ন সিংহ

স্কুল ছেড়েছি পঞ্চান্ন বছরের বেশি হয়ে গেল। এই সময়ে কত কি বদলে গেল ; তার কত কী মনে রাখতে পারলাম, তার টেক্সট ছবি আজকের যুগের অডিও ভিডিও সংগঠিত, তখনকার ছেঁড়া বিবর্ণ অসম্পূর্ণ তথ্যরাজি রাখতে চেয়ে বা না চেয়ে — তা থাকলেও লিখবে কে ? পড়বে কে ? আজ বাতাসে ওড়ে না কোনো হালকা কাগজ বা উড়লেও কঠিনভাবে তার মৃদু প্রতিলিপি চলে আসে দ্রুত; শাসনবাণীতে আমরা এখন বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। পরিবেশ বদলে যাচ্ছে, মানুষ প্রকৃতি পাখি জন্তু গাছ সব। এ কথা এখন জনে জনে স্বীকৃত, বলেও থাকি শতসহস্রবার, আমরা নিজেরা পরিবেশের অনেক সময় প্রভুত্ব করেছি আজ চাকা ঘুরে তাই পরিবেশের দাসত্ব করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি। খেয়াও যে এখন সময়োত্তীর্ণ পরিবেশ অনুভব সচেতনতা মেনেই পারাপার করবে, দাঁড় বাইবে নব গতিতে।

তখন কি ছাই জানতাম ভূগোল বিজ্ঞান ইতিহাস এই সব বিষয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই পরিবেশ বিষয় যা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার জন্য ছটফট করছে। আমরা অতীত চারদিকে বর্তমান কী ঘটছে কী আবিষ্কার হয়েছে বা হচ্ছে সেই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে যাচ্ছি — চেহারা ঠিকঠাক রাখার জন্য, দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্য ; তখন অন্যান্য নিয়ম মানার জন্য ছিল বাড়ির ও পাড়ার দাদা দিদির অনুশাসন। স্কুলে বিষয় হিসেবে ছিল স্বাস্থ্য। সে নিয়ে বিস্তর কাহিনি হতে পারে, খেলাধুলো শরীরচর্চায় সেকালের বৈচিত্র্য দেখলে। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্র অবশ্য বেশ ছিপছিপে ছিল, স্বাস্থ্য যারা করত তারাও ওই বই পড়ে বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে নয়।

শুনেছি স্কুলের মাঠ অত ছোট ছিল না, আমাদের ছোটবেলাতেও তা দেখেছি, অনেক গাছ। তা বড় বড় পাঁচিলের পাশে হতেই হবে । পাঁচিল যদি কেউ নাই টপকাল সে স্কুলে গল্পই তৈরি হল না, গাছে উঠে আম বা জামরুল পাড়তেই হোক বা পালিয়ে উঁচু ক্লাসে ধূমপান বা সিনেমা দেখতেই হোক। আহত হলে ডাক্তার ফার্স্ট এইড বক্স প্রয়োজনে মিক্সচার বা ইনজেকশন নিয়ে সদা তৎপর লোকজন যথেষ্ট ছিলেন, ছিলেন প্রধান শিক্ষক অন্যান্য মাস্টারমশাইরা রুল-এর বিবিধ অর্থ ও প্রয়োগ ঘটাতেও তৈরি। এক একটি ঘটনা পরে বলতে বলতে বাড়তি ব্যাপ্তি নিয়ে বহু মাত্রায় গল্প উপন্যাস হয়ে যেত। আমরা যুগে যুগে তা পড়েছি এবং পরম্পরায় সব রকম ভালোমন্দ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি। এখনো তা বলে থাকি, আধুনিক কাছের ও দূরত্বের পরিবেশভুক্ত হয়ে কত দলে বা গ্রুপে।

বাড়ির সামনেই ছিল তখনকার একডালিয়া পার্ক , যা আজ বহুদিন অবলুপ্ত হয়ে বিজন সেতু। স্কুলে যেমন আরো ঘর বাড়ি উঠল বড় দাবিতে, আরো বড় প্রয়োজনে এই পার্কের মাটি পাথর গাছ সব চলে গেল, রেখে গেল আকাশ

আর আমাদের অজস্র স্মৃতি ; অথচ এই মাটির ধুলো কাদা এমন মেখেছি খেলতে খেলতে, আজকের নিরিখে তার ছবি তুলে রাখলে অসুস্থতা এবং হাজার রকম রোগের কথাও এসে যেতে পারত, বাতাস বিবিধ কারণে মনোরম থাকলেও। উঁচু ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের ধূলামন্দির মুখস্থ করতে করতে। পরিবেশ বদলে যায়, আমরা বদলে যাই, মানিয়ে নিই।

আমাদের স্কুলে ঢোকার জন্য তিনটে গেট ছিল, এখনও তাই। বিবিধ কাজে তার প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণ হত। বেশি ভিড়ে, অনুষ্ঠানে পেছনের গেট খোলা। সামনের দুই গেটের একটিতে সবাই মূলত ঢোকে। এমনকি আগে শুনেছি দারোয়ানের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকতেন স্কুল শুরু হওয়ার আগে, উপস্থিতি সময়মতো হচ্ছে কি না দেখতে, তা ছাত্র ছাড়া মাস্টারমশাইদের উপর নজরদারি করতেও। প্রথম ও দ্বিতীয় গেটে তালা ঝুলত ; আমরা ওই গেট দুটি হাত বাড়িয়ে কত কী বারণ কেনা জিনিস কিনলাম, খেলাম, আমাদের তখন সব সময়ে বেরোনোর অবস্থায় ছিল না। পেছনের গেট তুলনায় বড় গাড়ি লরি ঢোকার জন্য। একটা বাস ছিল, স্কুলের বাস ছিল, কেউ কেউ আসত। আমরা যারা স্কুলের কাছাকাছি থেকেছি, তারা বিশেষ কারণে চেপেছি , যেমন বিড়লা মিউজিয়াম যেতে। বাসচালকদের আমার মুখ নাম মনে নেই। আমাদের কত দারোয়ান বা অন্যান্য স্কুল কর্মীদের দেখেছি খুব কাছ থেকে যে তাদের কথা বললে শেষ হবে না।

গাছ কারা কারা কে কে কখন পুঁতেছিলেন, সে হিসেব সব অডিট রিপোর্ট বা পুরোনো সঞ্চারীর মত বিবিধ কারণে হারিয়ে গেছে, কখনো তার জন্য উই আবার কখনো ‘উই’ মানে আমরা দায়ী । কেউ গাছ ফুল ফল পাতা চেনালেও আজ তা বিশেষ মনে নেই, কারও লেখাতেও তেমন পাই না । পরে পরিবেশ দিবসের আয়োজনে স্কুলে প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে ছবি তুলেছি, গাছ ঘিরে বেড়া ছিল, গরু না আসুক; আগে ফুটবল খেলায় এক জোরালো লাথির এক ব্যবহারে শিশু বা কিশোর গাছের অপমৃত্যু দেখেছি, কাচ ছাড়াও। আমরা কেউ কেউ বড় গাছের নীচে কম দাঁড়াতাম, যদি ডাল ভেঙে পড়ে। তা পড়ল, স্কুলকে পরিষ্কার করতে হত। সেটি নিয়মিত হত। বেশ কজন রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। ঘরদোর জানলা বেঞ্চি টেবিল চেয়ার বোর্ড মায় সব ঘরেই কয়েকজন মহাপুরুষদের বা অন্য চিত্র ভালই পরিষ্কার থাকতো, যতটা আমরা অন্যভাবে ময়লা করে ফেলতাম।

স্কুলে আসত ছাত্ররা বেশিরভাগ হেঁটে। কেউ ট্রামে বাসে বা রিকশ করে, হয়ত খুব দূরের কয়েকজন গাড়ি এবং প্রয়োজনে ট্যাক্সি করে। স্যারদের অনেকে কাছে থাকতেন, অনেকে দূরে। উপেনবাবুর পর প্রধান শিক্ষক প্রফুল্লবাবু আসতেন সেই পাইকপাড়া থেকে। তবে ১৯১৪ সালে স্থাপিত আমাদের স্কুল সেই সময়ে এমন একটি স্কুল হিসেবে চিহ্নিত, যে সোনারপুর থেকে ট্রেন করে ছেলেরা আসতেন মাস্টারমহাশয়রাও। হরিসাধন ঘোষ যিনি স্কুলে পড়েছেন, ১৯২২ উত্তীর্ণ, সম্ভবত স্কুল থেকে পাস এবং স্কুলেই প্রথম শিক্ষক, দীর্ঘদিন বাংলা পড়িয়েছেন । শুধু তিনি নন, আসতেন প্রখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী শুভেন্দুশেখর বসু, প্রথমে পদার্থবিদ্যা পরে ISI, অকালে তাঁর প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ

একটি শোকবাণী লেখেন ; তাঁর ভ্রাতা, মোহনবাগানের এককালের সহ সভাপতি পূর্ণেন্দু কুমার বসু, যিনি ছিলেন ফলিত গণিতের ছাত্র , পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও প্রধান, পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যও বটে; তাঁকে আমরা কেউ কেউ শেষ জীবনে স্কুলে আসতে দেখেছি , স্কুল অন্ত প্রাণ, খেলাধুলাতেও, অনেক কমিটিতে, তাঁর তখন সেই চেয়ারে বসা চেহারা দেখে কেউ ভাবতেই পারত না যে তিনি একসময় দারুণ গোলকিপার ছিলেন। তাঁদের আত্মীয়দের আমি অনেককে চিনতাম, একটা রহস্য ছিল সবাই অবিবাহিত ; আসল যৌথ পরিবার বলতে যা বোঝায়। আমার দাদার সময় পড়তেন দিলীপ কুমার সরকার, তাঁর কবিতা প্রকাশ স্কুল পত্রিকায় দেখেছি, ওঁর ভাই রথিন সরকার আমার সঙ্গে পড়ত, এম. কম. পরে, কর্ম যোগাযোগ এবং কাজকর্মের ফাঁকে নেশায় CABর ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। ওর দেবেনবাবুর ডাস্টারি মার হজম করার অসীম ক্ষমতা ছিল। সে সময়ে তার হাসিও মধুর ছিল। চেহারা ছিল। বাড়ি গিয়ে মুড়ি আর ফুলকপি ভাজা খেত। ওকে নিয়ে প্রচুর গল্প বলা যায় ।

আসত প্রদীপ ঘোষ। হরিসাধনবাবু আমাদের ক্লাস ইলেভেনে বাংলা সাহিত্যের কথা পড়াতেন। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে অনেকবার দেবতার গ্রাস পাঠ করতেন। খুবই পান খেতেন। পাঠ করতে করতেও, বোধহয় বেশি করে। সেই পানের পিকের কথা শুনেছি, দেখেছি ছড়িয়ে যেতে।

তিনতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে একদম প্রথম ঘরে আনন্দঘর। ওইখানে এক বছর স্কুলের প্রথম ক্লাস সতরঞ্চিতে মাটিতে বসে। একটু উঁচুতে, ঠিক চেয়ার নয়, ঝর্ণাদি বেশিরভাগ সময়, ছিলেন আরো দুই দিদিমণি নমিতাদি ও সীতাদি। দুজনেই সেনগুপ্ত। পরের বছর ওই দুই দিদিমণিকে পাই বেশি করে, তখন ওই তিন তলার আরো ডানদিকের ঘরে, তখন সেকশন A। বেঞ্চিতে বসে। সাদা জামা, খাঁকি হাফ প্যান্ট পরে। পা তখন মাটি স্পর্শ করে না, পা দোলাই। সে পা কবে মাটিতে স্পর্শ করল? তবে এত লম্বা বা মোটা হয় নি যে ওই বড় বড় দরজা পরে পেরোতে অসুবিধে হবে। এই দুই দিদিমণিই বিয়ের পর চলে যান। আমরা পরের ক্লাসে একতলায় চলে গেলাম, চারদিক দেখতে বেশি করে শিখলাম, বয়স্ক শিক্ষকদের অন্য রকম শিক্ষা শিক্ষণের, সেই সময়ের পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত, পাঠ নিতে শুরু করলাম। উঁচু ক্লাস পর্যন্ত সে ব্যবস্থা চালু থাকলে সেই পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউ উচ্ছেদ করে নি, কি ঘরে, কি বাইরে। আজও কি? তখন মর্নিংএ উঁচু ক্লাস ছিল ফাইভ। অঞ্জনাদির আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ক্লাস নেননি। ঝর্ণাদি, অবিবাহিত ঝর্ণা রায় , কসবার দিকে এক ফ্ল্যাটে গেলেন , শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেছি।

ক্লাস নাইন সেকশন B আর ইলেভেন সেকশন B একই ঘর, দোতলার প্রায় শেষে, আমাদের জন্য বরাদ্দ হল। টেন B ছিল ওই দোতলায় নতুন বাড়ির প্রায় শেষে। আমাদের অনেকেরই পাশের বড়লোক বড় বাড়ির দিকে উঁকিঝুঁকি ছিল আর সেই হিসেবে বিশেষ ছাত্রদের বসা ও বাড়াবাড়িটাও চলে।

শুনেছি বিদ্যাসাগর এমনতরো অভিযোগ শুনে সংস্কৃত কলেজে জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যদিও তখন শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কার বলেছিলেন সংস্কৃত কালিদাস কাব্য পড়িয়েছেন, তাই তিনি বললেন ছাত্রদের বিচলিত হবারই কথা । আমাদের চাকীবাবু ও নারাণবাবু যথাক্রমে সেই সময়ে সমাজবিদ্যা ও বাংলা পড়িয়ে চলেছেন অতি উৎসাহে , বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে । পরিবেশ যুগে যুগে সবই কি আকার কন্টেন্ট ফর্ম রীতি আমূল বদলে দেয়?

আসা যাওয়ার যাত্রাপথ নিয়ে লিখতে বসে স্মৃতি অন্য পথে টেনে নিয়ে গেল। তা কিছুটা হবেই। স্কুলের চারদিকে যারা থাকত প্রায় সত্যই বহু সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে ; তারা প্রায় নিয়মিত থাকত, অনেকদিন, ভাড়া বা নিজে বাড়িতে, আত্মীয়র কাছে এসে, যৌথ পরিবারে, তাঁরা আজ দেখি কেউ কেউ বাড়ি করেছে, কেউ কেউ দূরে বাড়ি কিনে চলে গিয়েছে, কিন্তু অনেক পরে সময় পেলে যোগাযোগ রেখেছে। স্কুল ছিল সত্যভামা , চিত্তরঞ্জন বা তীর্থপতি, একটু দূরে, পরে এসে গিয়েছিল সাউথ পয়েন্ট, আরো একটু দূরে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল। এখনকার যে কসবা অঞ্চল সেখানে থেকেও আসত অনেকে ; গরমে ওই ছোটবেলাতে মাথায় ছাতা নিয়ে আসত পি মজুমদার বাড়ির আমাদেরই এক সহপাঠী। পরম্পরা মেনে জ্যাঠা বাবা কাকা ভাই সব নিয়ে পড়ার দল তখন অনেক বেশি এ তল্লাটে। এমনকি কি আগে পরে প্রজন্মরাও । গত বেশ কয়েক দশকে অনেক বেশি ছাত্র আসে কসবা অঞ্চল থেকে।

পাশে ছিল মেয়েদের স্কুল, কমলা চ্যাটার্জি স্কুল। সাউথ পয়েন্ট কো-এড অনেক পরে, একটু দূরে, একটু অন্যরকম। আমাদের অনেক প্রাক্তন ছাত্ররা পরে ওই স্কুলই বেছে নেন পরের প্রজন্মের কথা ভেবে। তবে নবনীতা দেব সেনের খুব ছোট বেলায় ইচ্ছে ছিল তাঁর দাদা বা দাদাসমদের স্কুল দেখতে। ঢুকতে দিত না। আবার আমার দিদিরা ও পাড়ার অনেককে জানতাম ওই কমলা স্কুলে চ্যাটার্জি স্কুলে পড়তে, কিন্তু সেখানে দ্বার অবরুদ্ধ ছিল ছাত্রদের জন্য, যাদের গোঁফ ছোট ছিল, সেখানে দারোয়ান, ইয়া গোঁফ, ভক্তির আর ভয়ের উৎপত্তি বোধহয় সেখানেও শুরু, আমাদের স্কুলের রামবিলাস বা রামসেবকের মতো নয়, জানি না সন্ধ্যায় তাদের সঙ্গে দেখা আড্ডা হত কি না, আমরা সরস্বতী পুজো বা ওই রকম কোনও অনুষ্ঠানে প্রায় মাথা নিচু করে নমস্কার করে চলে আসতাম। প্রসাদ কি পেতাম ? তবে এটাও জানি কিছু গল্প তখন তৈরি হয়েছে, এখনো হয়, পরবর্তী সময়ে আরো সাহসীদের সংসার প্রবেশের। বন্ধুত্বের সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়, পরিবেশ আধুনিক হয়ে যন্ত্র নিয়ে যন্ত্রণা দেয়। কাহিনির যাত্রাপথ অন্যদিকে বইতে থাকে এবং নিরন্তর গাওয়া হতে থাকে সেই পথের যদি না শেষ হয়।
(চলবে)

রম্য রচনা

গজাননবাবুর পরিবেশচর্চা

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

গজাননবাবু বললেন, "পরিবেশ কোথায় যে দুদণ্ড সাহিত্যসংস্কৃতিচর্চা করব নিভৃতে?"

পরিবেশ সম্পর্কে এমন একটা উষ্মাপ্রকাশে সকলেই অল্পবিস্তর আপত্তি করলেন। কেন খারাপটা কী? এমন দিঘির ধার, চারিদিকে তাল-নারকেলের বন, স্নিগ্ধ সমীর -- আর কী চান গজাননবাবু! কেউ বললেন, "পরিবেশমন্ত্রী বলে গেছেন, আমরা ইউনেস্কোর পরিবেশ পুরস্কার পেতে পারি অদূর ভবিষ্যতে।"

গজাননবাবু বললেন, "শান্তি। শান্তির পরিবেশ চাই। একটু মুক্তি চাই আপনাদের অত্যাচার থেকে। আমার বৈঠকখানায় বসে পরনিন্দা-পরচর্চা-গ্রাম্য গুজব আপনারা দয়া করে বন্ধ করলেই সেই পরিবেশ ফিরে পাব।"

সবাই বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, চা আর তেলেভাজা মুড়ি এলেও মুচমুচে বিষয়ের অভাবে সকলেই বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বিষয় নেই এমনটা নয়। বিস্তর বিষয়, গণ্ডায় গণ্ডায়। কেচ্ছা কেলেঙ্কারির অভাব নেই। কিন্তু কোন্ বিষয়ের চর্চায় পরিবেশ যে দূষিত হবে বুঝতে পারলেন না কেউ।

মনোরম বিকেল, চা তেলেভাজা সহযোগে মুচমুচে রসালো আলোচনা -- এ পরিবেশ যখন তাদের সবার কাছেই কাম্য, গজাননবাবুর কাছে নয়। আপেক্ষিক ব্যাপার।

সন্ধের মুখে গজাননবাবু ভ্রমণছড়ি হাতে সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোলেন। দিঘি পেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে হরিসভার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন এবং শুনলেন সেখানে ধুন্ধুমার কীর্তন হচ্ছে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে। গজাননবাবু জানেন এ সময়টা মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক চলছে। আজকাল পড়াশোনার জোয়ার এই মফসসলেও এসে পড়েছে। আশেপাশে অনেক পরীক্ষার্থী। এই পরিবেশে কী ভাবে পড়াশোনা করবে তারা। অথচ হরিসভা প্রাঙ্গণ আর রাস্তার ধারে যেসব মানুষ বিভোর হয়ে নামগান শুনছেন, তাদের কাছে এমন পরিবেশই আদর্শ। কিন্তু গজাননবাবু প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাই, একজন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষও বটে। তার কাছে মাইক-প্রচারিত নামগানের এই পরিবেশ অসহ্য মনে হতে লাগল ছোটোদের লেখাপড়ার ক্ষতির কথা ভেবে।

গজাননবাবু কীর্তনের উদ্যোক্তাদের বললেন, এই নামগান বন্ধ করুন। কথায় কথা বাড়ল। উদ্যোক্তাদের দুএকজন শুধু ধাক্কাধাক্কি করলেন না, গজাননবাবুর বৈকালিক ভ্রমণের ফতুয়াটাও ছিড়ে দিলেন । এরা রাতে মদের মোচ্ছব করে শুনেছিলেন বটে, কিন্তু এমন গুন্ডামির পরিবেশে আগে পড়েননি গজাননবাবু।

এই গুন্ডামি ষণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি থানায় গেলেন। থানার মেজবাবু ডায়ারি নিতে নিমরাজি। তার ভয় লোকাল পঞ্চায়েতপ্রধানকে। পঞ্চায়েতপ্রধান ওই হরিসভার সভাপতি। সামাজিক চাপের কথা বলে মেজবাবু ডায়ারি করতে নিষেধ করলেন গজাননবাবুকে। গজাননবাবু বললেন, "থানায় দেখছি দুর্নীতির পরিবেশ! সামাজিক চাপ না হাতি! আপনি পঞ্চায়েতপ্রধানের ভয় পাচ্ছেন!" মেজবাবু বললেন, এতে আপনারই ক্ষতি, আপনি ভাবছেন, থানায় এসেছেন, কেউ আপনাকে ফলো করেনি? করেছে। আপনি নিজের বিপদ নিজেই ডাকছেন কিন্তু।"

গজাননবাবু প্রমাদ গুনলেন। এরা একটা ভয়ের, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। এই পরিবেশকে জাঁকিয়ে বসতে দিলে সুস্থ সমাজগঠন তো দু:স্বপ্ন। থানায় বসেই তিনি মোবাইলটা বের করলেন। তারপর একটা ফোন লাগালেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তার ছেলেবেলার বন্ধু শুধু নয়, সে বন্ধুত্ব আজও অটুট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন ধরে বললেন, "বল্ রে গজা, আবার কোথাও কিছু পাকিয়েছিস নাকি?"

একটু পরেই হোমমিনিস্ট্রি থেকে যে ফোন এল বড়বাবুর কাছে, তার ফলস্বরূপ বড়বাবু মেজোবাবুর প্যান্ট খুলে নিলেন। গাড়ি করে গজাননবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেই গাড়িতেই কীর্তনের উদ্যোক্তাদের ধরে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে এল পুলিশ। সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত করা, দাঙ্গাহাঙ্গার পরিবেশ তৈরির জন্য বেশ কটা কড়া কড়া কেসও দেওয়া হল সেইসব সমাজসংস্কারকদের। পঞ্চায়েতপ্রধানকেই ফোনে মেজোবাবু চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেবার হুমকি দিয়ে দিলেন। বেশ একটা সাহসের পরিবেশ ফিরে এল থানায় এতদিন পর।

একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ তৈরির জন্য মানুষ কতটুকুই বা করে! যারা গাছ লাগাচ্ছেন, গাছ বাঁচাচ্ছেন, প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়ছেন -- তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন বটে, কিন্তু সুন্দর সামাজিক পরিবেশ তৈরির জন্য কী করছেন! সন্ধেবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে একথাই ভাবছিলেন গজানন মল্লিক। সামাজিক পরিবেশ গড়তে গেলে ঐক্যবদ্ধ লড়াই দরকার। সকলে তো আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বন্ধু নন। এই ভয়ের সন্ত্রাসের পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করা কারুর একার পক্ষে সম্ভব নয়।

একাই বসে গুনগুন করে গান ধরলেন গজানন, "বাঁশরী বাজায়ে এসো বংশীধারী, এসো নন্দদুলাল গিরিধারী, নাচিতে নাচিতে এসো বনচারী ..."। এসব গান তার মায়ের মুখে শোনা। এক সুন্দর সাংগীতিক পরিবেশ ছিল তার আদি বাড়িতে। তারা যে নামকরা গায়ক রামচতুর মল্লিকের লতায়পাতায় আত্মীয়, তা জানতেন গজানন। দারভাঙা ঘরানার

ধ্রুপদ তাদের রক্তে। তার মামার বাড়ি বিহারের সমস্তিপুর। তার মামারাও ছিলেন ওস্তাদ গাইয়ে, একই ঘরানার। এ হেন পরিবেশে মানুষ হয়েও গজানন হেডমাস্টার হয়ে গেলেন ভাগ্যের ফেরে, আর বিশাল পৈতৃক ভিটেবাড়ি ছেড়ে কিনা বসত গাড়লেন এক অজ গ্রামে। পড়াতে পড়াতেই বিয়ের বয়স পেরোলেন, অর্ধেক মাথার চুল খোয়ালেন, সেই গাঁ একদিন মফসসল শহর হল। গানের পরিবেশ থেকে শিক্ষার পরিবেশ -- এখন ভাবছেন আবার সংগীতের পরিবেশে ফিরবেন। আবার চর্চা শুরু করবেন।

গজাননবাবু একটা জিনিস বুঝেছেন, কোনো খারাপকে বদলাতে হলে খারাপের সমালোচনা বা বিরোধিতা করলেই হয় না, তার পাল্টা ভালো জিনিসের আয়োজন করতে হয়। ভালোর সন্ধান না পেলে মানুষ কালোর জগতেই লেপ্টে থাকে। তাই মনে মনে সংকল্প করে ফেলেছেন, কিছু করবেনই। চোখের সামনে এই যে তারই ছাত্রদল বা ছাত্রসমরা বেড়ে ওঠার সময় উন্মার্গগামী হচ্ছে, তাদের সামনে আদর্শ কিছু নেই বলেই তো। তাই এমন আদর্শ কিছু প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা তাদের আলো দেখাবে।

গজাননবাবু একা মানুষ, সারা জীবনই টাকা তার হাতে উদ্বৃত্ত থেকেছে। সেই টাকা দিয়ে আট কাঠা জমিতে বিরাট বাগান সহ এই ছিমছাম একতলা বাড়ি। সে বাড়ির ছ ছটা ঘর। বাড়ির লাগোয়া দিঘির পাশে চমৎকার টানা বারান্দা। সবই খা খা করছে। মানুষের তো নিজের জন্য বরাদ্দ সাড়ে তিন হাত জায়গা। তাই গজাননবাবু ঠিক করলেন, নিজের গৃহ থেকেই শুরু হোক তার এই সংস্কৃতিযাত্রা। বিপুল জায়গায় তিনি সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র বানাবেন। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন বয়সিরা শেখানে আঁকবে, গাইবে, নাচবে, লেখালিখি করবে। তার বাগানে কচি কচি শিশুর দল হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে বড় হচ্ছে -- এ কথা ভেবে দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল গজাননের।

এই সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধনের দিন উদ্বোধনী ভাষণে বললেন তিনি, "আমাদের সমাজ একটা বাগানের মতো হোক। তাতে সুস্থ সংস্কৃতির মাটি-জল-বাতাস দিয়ে সুস্থতার বীজ পুঁততে হবে। যে সব মানুষ সেই বীজ থেকে জন্ম নেবে, তারাই বনস্পতি বা মহীরুহে পরিণত হবে। তাদের ফুলেফলে সমাজ ভরে উঠবে। তাদের পরাগমিলনে তৈরি হবে ভাবী সমাজ। একটা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ... ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গজাননবাবু তার প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিক করেছেন 'পরিবেশ'।

সুন্দরবনের অজানা কথা

কৌশিক ত্রিপাঠী

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে বাড়ছে তাপমাত্রা - বরফ গলার ফলে সমুদ্রে জল স্তর বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত, বিভিন্ন নিচু জায়গা জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে জঙ্গল সাফ করে দেওয়ার ফলে পাহাড়ে ধস নামারও আশঙ্কা বাড়ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ সংস্থা ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) রিপোর্টে কলকাতা, সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আইপিসিসি-র ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্টে বলা হয়েছে 'সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে যে দেশগুলির বিপদ সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে ভারত অন্যতম, বিশেষ করে আমাদের সুন্দরবন একদম প্রথম সারিতে।

- বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত সুবিশাল ম্যানগ্রোভ ব-দ্বীপ সুন্দরবনে বিগত দুই দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে গড়ে ৩ সেন্টিমিটার করে বেড়েছে, যা বিশ্বের উপকূলীয় ক্ষয়ের দ্রুততম হারগুলির একটি।
- সুন্দরবনের ভারতীয় অংশে, কয়েক ডজন দ্বীপের বাসিন্দার বাড়িঘর সমুদ্রে গ্রাস হবার ফলে কৃষিজমি নোনা জলে বিষাক্ত হয়েছে, যা গ্রামবাসীকে স্থানান্তর করতে বাধ্য করেছে।
- সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শিকারের জমিও কমেছে সমুদ্রের গ্রাসে , ফলে তাদেরকে গ্রামবাসীদের গবাদিপশুকে আক্রমণ করতে হচ্ছে ।

এই তো কিছুদিন আগে কথা হচ্ছিল ঘোড়ামারা দ্বীপের শঙ্কর ভূঁইয়ার সঙ্গে — তার কাছে শুনলাম রাজ্য সরকার ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য সাদা কংক্রিটের কাঠামো তৈরি করেছে অনেক অঞ্চলে কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলিও সমুদ্রের নোনা জলকে আটকাতে পারছেনা। প্রায়ই উচ্চ জোয়ারে জল জমিতে চলে আসছে। ইতিমধ্যেই সুন্দরবনে ঘরবাড়ি হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। প্রতি বছর হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হচ্ছে সাথে উচ্চ লবণাক্ততার কারণে কৃষিজমি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জোয়ার-ভাটা সুন্দরবন গঠন করেছে ; প্রাকৃতিক ছন্দে দ্বীপগুলো অদৃশ্য হয়ে আবার আবির্ভূত হয় কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত দুর্যুগের ফলে বৈচিত্র আরও চরম আকার ধারণ করেছে, কোথাও কোথাও জমি বাঁচাতে স্থানীয়রা লবণ-প্রতিরোধী ধানের চাষ শুরু করেছে। শঙ্কর ভূঁইয়ার মুখে শুনলাম বর্তমানে সুন্দরবনের অনেক তরুণ কাজের জন্য কলকাতায় চলে যাচ্ছে, "তারা এখানে থাকতে চায় না — সুন্দরবনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই বলে"।

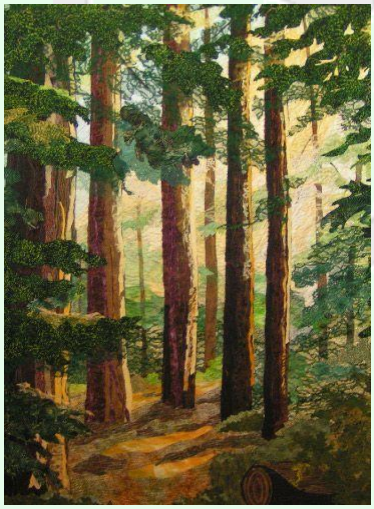

ঘন ঘন বাঘের আক্রমণ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাঘের শিকারের জমিগুলো সমুদ্রের গ্রাসে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফলে তারা খাবার আর আশ্রয়ের খোঁজে নদী-নালা পার করে গ্রামে চলে আসছে - এ এক আশ্চার্য ঘটনা , একদিকে যখন গ্রামের মানুষ সমুদ্রের নোন জল থেকে বাঁচতে বনের গভীরে যাচ্ছে অপর দিকে বাঘ বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে গ্রামগুলোতে খাবার আর বাসস্থানের জন্য প্রায়ই রাতের অন্ধকারে প্রবেশ করছে, ফলে বাঘে মানুষে সংঘাত বেড়েই চলেছে। শঙ্কর এর কাছে জানলাম গত বছর কুমিরমারি গ্রামের লক্ষ্মী মণ্ডলের স্বামী শিবুর কথা, বেচারা মধু এবং কাঁকড়া ধরতে দুই বন্ধুর সঙ্গে খোনাখালি নদীর অপরপারে জঙ্গলে গিয়েছিল হঠাৎ একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নৌকায় শিবুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, সেই সময় বেচারি মাছ ধরছিল, অনেক চেষ্টা করেও শিবুকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচানো যায়নি। বর্তমানে লক্ষ্মী মণ্ডলের ছেলে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী , গ্রামে রিকশা চালায়। প্রায় একই ঘটনা পাশের গ্রামেও ঘটেছে রেখা মণ্ডলের সাথে — কয়েক মাস আগেই যখন তার স্বামী রবি এবং অন্য দুই জেলে সাত আট দিনের জন্য মাছ ধরতে সাগরে গেছিল। দ্বিতীয় দিন সকালে, রবি খাবার তৈরি করার সময় একটি বাঘ বালির চর থেকে নৌকায় লাফ দেয়। অকস্মাৎ হামলায় রবি ও বাঘ দুজনেই নদীতে পড়ে যায়। অন্য জেলেরা বাঘকে ভয় দেখানোর জন্য নৌকার দাড়ি নিয়ে জলে ঝাপিয়ে পড়ে কিন্তু ততক্ষণে রবির গলায় আর মাথার পিছনে মারাত্মক ভাবে বাঘ কামড় বসায় তারপর সকলের চিৎকার চেঁচামেচিতে বনের ভেতর পালিয়ে যায়। কিছুক্ষনের ভেতরেই রবি মারা যায়।

এই হামলা শুধু লক্ষ্মী বা রেখাকে তাদের স্বামীর থেকেই বঞ্চিতই করেনি। এই ঘটনা তাদের সমাজে বহিষ্কৃত করে তুলেছে যেখানে "বাঘ বিধবা" হওয়ার কলঙ্ক তাদের বহন করতে হচ্ছে । সুন্দরবনের গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস কোনো মানুষ বাঘের আক্রমণের শিকার মানে সে বনের রক্ষক বনবিবির ক্রোধকে আহ্বান জানিয়েছে । তাই গ্রামে বিধবাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয় , মাঝে মাঝেই স্বামী-খেগো ও বলা হয়। অথচ একসময় লক্ষ্মী বা রেখা গ্রামে বেশ জনপ্রিয়ই ছিল, তারা প্রতিবেশীদের সাথে মেলামেশাও করত। এখন তারা কার্যত এক ঘরে , প্রতিবেশীরা কেউ তেমন কথাও বলে না। সুন্দরবনের গ্রামগুলোতে শত শত মহিলা বাঘের আক্রমণের ফলে আজ বিধবা হয়েছেন। বর্তমানে লক্ষ্মী মণ্ডলের ছেলে কালীপ্রসাদ চায় কলকাতায় চলে যেতে, লক্ষ্মীও রাজি; আজ এই জলাভূমিতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাদের । বাঘের আক্রমণ দিন কে দিন বাড়ছে, তাদের আরও খাবারের প্রয়োজন তাছাড়া নদী গুলির জলস্তর বেড়ে যাবার ফলে কুমির, বিষাক্ত সাপ এবং এমনকি হাঙ্গরকেও আজ মানুষের বসতির কাছাকাছি নিয়ে এসেছে ।

সরকারি অনুদান

২০২১ সাল থেকে রাজ্য বন্ দফতর থেকে সর্বাধিক ৫,০০,০০০ টাকা জীবন বীমা কভারেজ বাঘ-বিধবাদের জন্য দেওয়া হয়, তবে সেটি শুধুমাত্র বাফার জোনে মাছ ধরার এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরো সুন্দরবন এলাকার জন্য নয়। এর ফলে অধিকাংশ জেলেদের পরিবারই এই কাভারেজ পায়না কারণ তারা বেশীরভাগই প্রচুর মাছের আশায় ম্যানগ্রোভ বনের গভীরে আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যায়। তাছাড়া বর্তমানে পর্যটনের জন্য সরকারের মাছ ধরার অনুমতি আরও সীমাবদ্ধ হয়েছে, চাইলেই সব জায়গায় মাছ বা কাঁকড়া ধরা যায় না।

মানুষ সহজ শিকার

ব্যাঘ্র আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এখন এলাকার মানুষজন তাদের মাথার পিছনে মুখোশ পরছেন। তাছাড়া অনেক গ্রামে বাঘের প্রবেশের বিরুদ্ধে বৈদ্যুতিক বেড়া ও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে কাজও করেছিল, কিন্তু এখন খুব একটা কাজ করে না । এই ব্যাপারে কথা বলেছিলাম কুমিরমারি গ্রামের বিজন চাচার সাথে; তাঁর বক্তব্য ছিল যেহেতু বাঘ এখন পরিবেশের কারণে আর মিষ্টি জল খেতে পায় না, পরিবর্তে নোনা জলই খেতে হয় তাঁর ফলে সে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, সে এখন কোনো বাধাতেই ভয় পায় না। এর আর একটা অজানা কারণও শুনলাম তা হল নোনা জল নাকি বাঘের দাঁত কে নষ্ট করে দেয় তাই জীর্ণ দাঁত নিয়ে সে ক্রমশ মানবভক্ষক হয়ে উঠছে কারণ ওটাই সহজ শিকার।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতীয় সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে বছরে প্রায় কুড়ি জন মানুষ মারা যায়। যদিও পরিসংখ্যানটি নাকি কেবলমাত্র জাতীয় উদ্যানের বাইরে যারা মারা যায় তাদের হিসেব আসলে কিন্তু প্রতি বছর বহু জেলে বা মধু সংগ্রহকারী জাতীয় উদ্যানের ভেতরেই বাঘের আক্রমণের শিকার হন। এলাকার মানুষ জন বলছেন সরকার চাইলেই এই সংখ্যাটা অনেক কমিয়ে আনতে পারে যদি এখুনি মধু সংগ্রহ আর কাঁকড়া, মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয় কিন্তু সেটা করতে গেলেও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে ।

সত্যি কথা বলতে, সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে তার জীববৈচিত্র আর সুন্দরবনের মানুষদের ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে উভয় সরকারকে এখুনি জরুরিভিত্তিক ভাবনা চিন্তা শুরু করতে হবে কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গত দুই দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে গড়ে ৩ সেন্টিমিটার (১.২ ইঞ্চি) বেড়েছে, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে চারটি দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে শুধু তাই নয় প্রায় 6,000 পরিবার উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে যা মানুষ ও বন্যপ্রাণী উভয়ের জন্যই হুমকিস্বরূপ।

ক্রিকেটের এক ডজন মজার ঘটনা

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

১. ১৯৭১ সালে ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে স্যার গারফিল্ড সোবার্স ভারতের ড্রেসিং রুমে গিয়ে প্রতিদিন খেলার আগে সুনীল গাভাসকারের কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতেন। কুসংস্কারবশেই করতেন। স্যার গ্যারি জর্জটাউন-গায়ানায় ১০৮ রানে অপরাজিত, ব্রিজটাউন-বার্বাডোসে ১৭৮ রান অপরাজিত এবং পোর্ট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে ১৩২ রান করেন। ভারতীয় অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার এ বিষয়ে জানতে পারেন। পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগে সোবার্স যখন ভারতীয় ড্রেসিং রুমে আসেন, তখন ওয়াদেকার গাভাসকারকে টয়লেটে লুকিয়ে রাখেন। খেলা শুরু হয়, আবিদ আলী রোহান কানহাইকে ২১ রানে আউট করেন। সোবার্স ক্রিজে আসেন এবং প্রথম বলেই আউট হন। স্যার গারফিল্ড সোবার্স ছিলেন ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর খেলোয়াড়। তিনি ছিলেন একজন অধিনায়কের পছন্দের খেলোয়াড়। অধিনায়কের সব চাহিদা পূরণ করতে পারতেন। তিনি বাম হাতি মিডিয়াম ফাস্ট, বাম হাতি অর্থডক্স স্পিন, চিনাম্যান ডেলিভারি, আর্মারেও দক্ষ ছিলেন এবং ব্যাটিংয়ে সারা মাঠ জুড়ে রানের ফোয়ারা ছোটাতেন। (উৎস: উইজডেন)

২. সুনীল গাভাসকার এবং জহির আব্বাস দুজনেই একটি সভায় বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন। গাভাসকার যথারীতি সময়মতো উপস্থিত হন, কিন্তু জহির আব্বাস আসছিলেন না। আয়োজকরা খুবই চিন্তিত ছিলেন। গাভাসকার বলেন, জহির সম্ভবত আসবেন না কারণ তিনি সুনীলকে ভয় পান। গাভাসকারের একমাত্র টেস্ট উইকেট ছিল জহির আব্বাসের, যাকে কিনা "এশিয়ান ব্র্যাডম্যান" বলা হত। গাভাসকার বলেন, যদি তিনি আসেন, আমি আবার তাকে তাকে তছনছ করে দেব। তবে, জহির শেষ সময়ে এসে পৌঁছোন এবং ভালোয় ভালোয় দুজনেই তাদের বক্তৃতা শেষ করেন।

৩. বিখ্যাত ইংরেজ আম্পায়ার ডেভিড শেফার্ডের গল্প। ৯০ এর দশকে কানাডার টরেন্টোতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সাহারা ইন্ডিপেনডেন্স কাপের একটি ওয়ানডে ম্যাচে তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত বেশ সন্দেহজনক ছিল। ভারতীয় বোলার দেবাশিস মোহান্তির বলে ইজাজ আহমেদের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে রবি শাস্ত্রী টিভি কমেন্ট্রি বক্স থেকে বলেন, "আমি ইজাজের ব্যাট ও বলের ফাঁক দিয়ে পরিচ্ছন্ন দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি। ডেভিড শেফার্ড, জেগে উঠুন, সূর্য উঠে গেছে"।

৪. ডেভিড শেফার্ড, জনপ্রিয় ইংরেজ আম্পায়ার। স্কোরবোর্ডে ১১১ (নেলসন), ২২২ (ডাবল নেলসন), ৩৩৩ (ট্রিপল নেলসন) এবং আরও এরকম সংখ্যার সময় মাঠে লাফ দিতেন। এটি ছিল তাঁর কুসংস্কার। যদি স্কোরবোর্ড ১০ মিনিটের জন্য এসব সংখ্যায় থেমে থাকত, শেফার্ড প্রতিটি ডেলিভারির পরে লাফ দিতেন তিনি বোলারের প্রান্ত বা স্কোয়ার লেগ যেখান থেকেই ম্যাচ পরিচালনা করুন না কেন। ক্যামেরার ফোকাস সবসময় শেফার্ডের পায়েই থাকত যখন স্কোর এসব সংখ্যায় থাকত।

৫. স্টিভ বাকনার, সেই লম্বা জ্যামাইকান স্কুল শিক্ষক ও ক্রিকেট আম্পায়ার, যিনি বেশ কয়েকটি ৫০ ওভার বিশ্বকাপ ফাইনালে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং প্রধানত শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। তিনি তার রায় প্রদানের সময় আঙুল তুলতেও আশ্চর্যজনকভাবে দেরি করতেন। টনি গ্রেগ, একদা ইংল্যান্ড অধিনায়ক, অলরাউন্ডার ও টেলিভিশন ধারাভাষ্যকার টেলিভিশনে বলেছিলেন — "বাকনার মাঠে থাকলে, আপনি কখনো নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত হয়ে খেলতে পারবেন না"।

৬. নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে, মহম্মদ আজহারউদ্দিন অসিদের বিরুদ্ধে একটি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন। অবশেষে তিনি নিজেই রান আউট হয়ে যান। টেলিভিশন ধারাভাষ্য বক্সে থাকা রবি শাস্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, "এটা আম্পায়ারের লাইন"। ব্যাটের কিছু অংশকে সেই লাইনের ওপারে ক্রিজের ভেতরে থাকতেই হবে। আজহার তার দ্বিতীয় রানটি নিতে একটু ঢিলেমি করেছিলেন এবং এর খেসারত দিতে হয়। রবি শাস্ত্রী মাইক্রোফোনের পেছনে দুর্দান্ত ছিলেন।

৭. জাভেদ মিয়াঁদাদ, বিখ্যাত পাকিস্তানি খেলোয়াড় অন্য দলের ব্যাটার, বোলার, ফিল্ডারদের, এমনকি আম্পায়ারদের উদ্দেশেও সাংঘাতিক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলতেন। ফিল্ডিং করার সময়, তিনি প্রতিপক্ষ ব্যাটারকেও উত্তেজিত করতেন। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভার বিশ্বকাপে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) ভারতের বিরুদ্ধে লিগ ম্যাচে, তিনি ভারতীয় উইকেটকিপার কিরণ মোরেকে নকল করে লাফিয়ে লাফিয়ে তাকে হতাশ করার চেষ্টা করেন। রিচি বেনো এবং ইয়ান চ্যাপেল ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন এবং বেনো বলেছিলেন "চ্যাটার চ্যাটার" - জাভেদ সবসময় নিজের সাথে নিজে কথা বলতেন। ভারতীয় অধিনায়ক আজহারউদ্দিন মাঠে এই অঙ্গভঙ্গিতে রেগে যান এবং অবশেষে আম্পায়াররা হস্তক্ষেপ করেন। মিয়াঁদাদ তারপরপরই মনোযোগ হারিয়ে জাভাগাল শ্রীনাথ, সেই মাইসোর এক্সপ্রেস, তার একটি ইনসুইং ইয়র্কারে আউট হয়ে গেলেন। সাধারণত, অনেক উইকেটকিপার স্টাম্পের পেছন থেকে উঁচু স্বরে কথা বলতেন এবং স্টাম্প-মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে শোনা যেত। লাফিয়ে আবেদন করা কিরণ মোরের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতীয় এবং পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের ভাষা আসলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারত, অন্য কেউ নয়।

৮. ৯০ এর দশকে, সংযুক্ত আরব আমিরাশাহির শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, বিখ্যাত বিবিসি রেডিও কমেন্টেটর হেনরি ব্লোফেল্ড ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি ওয়ানডে ম্যাচে টিভিতে কমেন্ট্রি করছিলেন। অনেক বলিউড অভিনেত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সব ফ্যান্সি কানের দুল পরেছিলেন। ব্লোফেল্ড কমেন্ট্রি করতে গিয়ে বলেন, "সব অভিনেত্রীরা ফ্যান্সি কানের দুল পরেছেন"; যখন ক্যামেরা একটি বড় দুলের দিকে যায়, তখন তিনি বলেন, "এটি দশকের সেরা কানের দুল হতে পারে"।

৯. নরম্যান ও'নীল এবং রিচি বেনো কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে একটি টেস্ট ম্যাচে দারুণ খেলেছিলেন। একটি বাংলা সংবাদপত্র তার শিরোনামে মজা করে লেখে, "অনিল আর বিনোদের দাপটে ভারত কুপোকাত"। অনিল এবং বিনোদ -- বাংলা নাম যার সূক্ষ্ম মজা ও'নীল এবং বেনোর নামের সঙ্গে এরা সাদৃশ্যপূর্ণ।

১০. ভারত একটি টেস্ট ম্যাচে নয় উইকেটে ব্যাটিং করছিল এবং তৎকালীন ভারতীয় অধিনায়ক সব খেলোয়াড়দের জন্য চা অর্ডার করেন কারণ প্রসন্ন এবং চন্দ্রশেখর ব্যাট করছিলেন। তিনি মজার ছলে বলেন যে আমরা শিগগিরই আবার বোলিং করতে নামব কারণ প্রসন্ন এবং চন্দ্র অচিরেই ফিরে আসবে। অন্তত ২৩ বার স্কোরবোর্ডকে বিরক্ত না করেই প্যাভেলিয়নের পথ ধরার রেকর্ড ছিল। চন্দ্রশেখর টেস্ট ক্রিকেটে তার মোট উইকেটের চেয়েও কম রান করেছেন। এই তালিকায় অন্য একজন খেলোয়াড় হলেন ক্রিস মার্টিন।

১১. ভারতীয় ক্রিকেটে একটি জনপ্রিয় রসিকতা ছিল এরকম যে একটি টেলিফোন কল আসে ভারতীয় ড্রেসিং রুমে এবং বিসি চন্দ্রশেখরকে চাওয়া হয়। চন্দ্র তখন ব্যাট করতে গিয়েছিলেন। ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ফোনটি তুলে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন কারণ চন্দ্র এক'দু বল খেলে এখনই ফিরে আসবেন। এবং সেটাই হয়েছিল, চন্দ্র আউট হয়ে ফিরে আসেন এবং ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন।

১২. স্যার লেন হাটন, ইয়র্কশায়ারের মানুষ, যিনি স্যার জিওফ্রে বয়কটের মতোই একজন অসাধারণ টেকনিশিয়ান ছিলেন, ওভালে অ্যাসেজে সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর ৩৬৪ রান করেন মাত্র ২২ বছর বয়সে। এই অসাধারণ ইনিংসের পর সন্ধ্যায় ইংল্যান্ড ক্যাম্পে ছিল উদযাপন এবং শ্যাম্পেন খাওয়ার সময়। তারপর স্যার লেন হাটন ডেনিস ক্রম্পটনের সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। একটি ট্রাফিক সিগন্যালে, যখন গাড়িটি থেমে ছিল, একটি ছোট ছেলে জাতীয় নায়ককে তার চমৎকার ইনিংসের জন্য অভিনন্দন জানায়, কিন্তু ছেলেটির পাশে থাকা মহিলাটি, তার মা, হাটনকে বললেন, "তুমি খুব ভালো খেলেছ, কিন্তু যদি আরেকটু রান করতে তাহলে আরও ভালো হত"। তখন স্যার লেন হাটন ডেনিস ক্রম্পটনকে বললেন, "তুমি জানো ডেনিস, মহিলাদের খুশি করা কতটা কঠিন"।

অথ বৃক কথা

রাজ ঘোষ

বৃক, অর্থাৎ নেকড়ে কুকুর গোষ্ঠীভুক্ত, এবং গৃহপালিত কুকুরদের সকলেরই উদ্ভব সুদূর অতীতে নেকড়ের থেকে। অথচ কুকুরকে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিলেও, নেকড়ের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা প্রাগৈতিহাসিক। এককালে তাবৎ স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বিচরণ ভূমির ব্যাপ্তির নিরিখে মানুষের পরেই ছিল নেকড়ের স্থান। কিন্তু মানুষেরই অত্যাচারে ওরা আজ ক্ষয়িষ্ণু। প্রত্যন্ত, জনবিরল এলাকাতেই কেবল ওদের আনাগোনা।

গ্রে উল্‌ফ (Canis lupus) বা ধুসর নেকড়ে — শৈশবে ইউরোপীয় রূপকথার বাংলা অনুবাদে যাদের আমরা পাঁশুটে নেকড়ে বলে জেনেছি — শুধু যে সব জাতের নেকড়ের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্ববৃহৎ এবং তিনটি মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাই নয়, পৃথিবীতে টিকে থাকার লড়াইয়ে অন্যতম সফল স্তন্যপায়ী। বিগত আড়াইশো বছরে গ্রে উল্‌ফের ৩৮টি উপপ্রজাতি চিহ্নিত হলেও তাদের অনেকগুলিই আজ বিলুপ্ত। বর্তমান নিবন্ধে গ্রে উল্‌ফকে নিয়ে সার্বিক আলোচনার পাশাপাশি আমরা তার কয়েকটি উপপ্রজাতির বিষয়ে আলোকপাত করব। এই গ্রে উল্‌ফেরই একটি অধুনালুপ্ত শাখা থেকে
সমস্ত গৃহপালিত কুকুরের উদ্ভব হয়েছে বলে জীববিদরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

অতীতে গৃহপালিত পশুর যম এবং মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপ থেকে গ্রে উল্‌ফ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উত্তর আমেরিকাতেও তার অবস্থা ছিল তথৈবচ। সেখানেও গত তিন শতাব্দী যাবৎ মানুষ এই নেকড়েকে শিকার করে, ফাঁদে ফেলে, বিষ খাইয়ে প্রায় বিলুপ্তির প্রান্তে এনে ফেলেছিল। যদিও বাস্তবে নেকড়ের গৃহপালিত পশুহত্যার হার ঐ বৃকমেধ যজ্ঞের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, আর তার মানুষকে আক্রমণ করার ঘটনাও ছিল নগণ্য। মজার কথা হল, নেকড়ে প্রায় নির্বংশ হয়ে এলেও, এর ফলে উত্তর আমেরিকায় তারই নিকট জ্ঞাতি কায়োটির খুব সুবিধা হয়ে যায়, তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে ব্যাপক ভাবে। গত সাড়ে চার দশক সময়কালে অবশ্য আইন প্রণয়ন ও যথাযথ সংরক্ষণের কল্যাণে অন্তত উত্তর আমেরিকায় নেকড়েরা উল্লেখযোগ্য প্রত্যাবর্তন করেছে।

বর্তমানে গ্রে উলফ IUCN (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজ়ার্ভেশন অফ নেচার) এর রেড লিস্টে “Endangered” বা সঙ্কটাপন্ন প্রাণীর তালিকা থেকে উন্নীত হয়ে “ Least Concerned” অর্থাৎ ন্যূনতম সঙ্কটাপন্ন প্রাণীর তালিকাভুক্ত হয়েছে। LC তালিকার তাৎপর্য হল, প্রাপ্তিস্থানের ব্যাপকতা ও বন্য পরিবেশে তার সাফল্যের কারণে সার্বিক বিচারে এই প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। যদিও LC চিহ্নিত একটি প্রজাতির কোন কোন

আঞ্চলিক উপপ্রজাতি স্থানীয় প্রতিকূলতার কারণে সঙ্কটাপন্ন হয়ে থাকতে পারে। বিচরণভূমির ব্যাপকতা এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণে পাঁশুটে নেকড়ের আকার ও গড়নে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ নিয়মে (Bergmann's Rule) কোনও প্রজাতির উষ্ণ, ক্রান্তীয় অঞ্চলের প্রাণীদের চেয়ে শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রাণীরা বড়সড় ও রোমশ হয়ে থাকে। নেকড়েদের মধ্যেও এটা দেখা যায়। তাই ইউরোপ-আমেরিকার পাঁশুটে নেকড়ে (Canis lupus lupus) তো বটেই, তার তিব্বতী/মঙ্গোলীয় সংস্করণ (Canis lupus filchneri/ chanco) এশিয়া তথা ভারতের সমতলের বাসিন্দা (canis lupus pallipes) অপেক্ষা ঢের তাগড়া আর রোমশ। তবে একই উপপ্রজাতির মধ্যেও আকার ও ওজনের বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। সার্বিক ভাবে এই পাঁশুটে নেকড়ে ২০-৭০ কিলোগ্রামের ভিতর হয়, এমনকি আলাস্কায় ৮০ কিলোগ্রামও হতে দেখা গেছে। যে কোন উপপ্রজাতিতেই মদ্দার থেকে মাদির ওজন ৫/৭ কিলোগ্রাম কম হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যে মাথা থেকে দেহ ৪০-৬৩ ইঞ্চি, আর লেজ ১৪-২২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। কাঁধের উচ্চতা ২৫-৩২ ইঞ্চি । এদের বেশির ভাগই ছাইরঙা আর তাতে ছিট ছিট কালচে দাগ থাকলেও, লালচে, মেটে, বাদামি এবং পুরো সাদা বা পুরো কালোও হয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকার এই কালো নেকড়েরা ১০-১৫ হাজার বছর আগে কুকুরের সঙ্গে সঙ্গমজাত দো-আঁশলা নেকড়েদের বংশধর বলে মনে করা হয়। কুকুর, শেয়াল ও কায়োটির সঙ্গে নেকড়ের জিনগত সাদৃশ্যের কারণে বর্ণসংকর খুব বিরল নয়।

তবে সব জাতের নেকড়ের মধ্যে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রে উল্‌ফই আকারে সবচেয়ে বড়। শুরুতেই বলা হয়েছে, পাঁশুটে নেকড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তিনটি মহাদেশ জুড়ে, আর তার থেকেই বোঝা যায় ওরা কত বিভিন্ন রকমের পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নেকড়েরা মূলত দলবদ্ধ জীব হলেও, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ভেদে তারা একক অস্তিত্বেও অভ্যস্ত হয়ে যায়, বা দলের সদস্যসংখ্যা কমে যায়। ইউরোপ-আমেরিকার গ্রে উল্‌ফ অনেক বেশি territorial বা এলাকা-সচেতন; নিজ এলাকায় অন্য দলের উপস্থিতি বরদাস্ত করতে তারা নারাজ। তুলনায় ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রে উল্‌ফ দলে তত ভারী নয়, অতটা এলাকা-সচেতনও নয়।

গ্রে উল্‌ফ দলবদ্ধ জীব। দলের নেতৃত্ব করে একজোড়া মদ্দা-মাদি, যাদেরকে আলফা মেল-ফিমেল বলা হয়। দলের মধ্যে এরাই সঙ্গম করে থাকে, কেননা দলটা হল একই পরিবার। অন্য সদস্যরা এদের সন্তান-সন্ততি, যারা সংখ্যায় ৫-১০। তার মধ্যে গোটাদুই প্রাপ্তবয়স্ক, ৩-৬টি অপ্রাপ্তবয়স্ক, আর ১-৩টি বাচ্চা। সাধারণত দলের মাথায় থাকা ঐ জোড়াটি প্রতিবছর ৩/৪টি বাচ্চার জন্ম দেয়। শাবকরা সচরাচর দেড়-দু বছর বয়স পর্যন্ত দলের সঙ্গে থাকে, তারপর

ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে ও বংশবৃদ্ধির তাগিদে। তবে পরিস্থিতি ভেদে চার-সাড়ে চার বছর পর্যন্তও তারা বাপ-মায়ের সাথে থাকতে পারে। শীতের দেশে মিলন ঋতু প্রধানত শীতের শেষে ও বসন্তে, তবে অনুকূল পরিবেশে বছরের অন্য সময়েও হয়ে থাকে, ফলে শাবকরাও বিভিন্ন সময়ে জন্মায়। মাদি নেকড়ের গর্ভধারণ কাল ৯ সপ্তাহ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতে ওরা বংশবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

নেকড়ের উচ্চকিত একটানা ডাক, যার ইংরেজী নাম 'howl', একটি বহুচর্চিত বিষয়। কারো মতে এটা শিকারে বেরোনোর আগে নেকড়েদের রণহুঙ্কার, কেউ কেউ বলেন এর উদ্দেশ্য দলের সবাইকে একত্রিত করা, আবার এই হাউল আসলে অন্য নেকড়েদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি এমনও অনেকে বলেন। মনের আনন্দে অথবা আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যেও হয়তো নেকড়েরা হাউল করে থাকে। হাউলের তাৎপর্য হয়তো এর সবকটাই, এবং তারও বেশি কিছু। তবে লক্ষ্ করার বিষয়, ইউরোপ-আমেরিকার নেকড়েরা যেমন নিয়ম করে 'হাউল' করে, ভারতীয় নেকড়েরা তা করে না। সম্ভবত দলে ভারী না হওয়ায় তাদের পক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব জানান না দেওয়াই শ্রেয়।
শীতের দেশে নেকড়ের ঘাড়, পিঠ আর সামনের অংশের ফার বা লোম খুব ঘন হয়। বসন্তে এই লোম অনেকটাই ঝরে পাতলা হয়ে যায়, ফের গজায় শরৎকালে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে নেকড়ের লোম অনেক খাটো আর পাতলা, তাদের লেজও তেমনই, শেয়ালের লেজের মত ঝাড়ালো নয়। দূর থেকে বা স্বল্পালোকে নেকড়ে আর শেয়ালের তফাত করতে এই ব্যাপারটা কাজে আসে।

চলার সময়ে নেকড়ের মাথা তার পিঠের সঙ্গে এক উচ্চতায় থাকে। ঘাড় ও মাথা তোলে সজাগ হয়ে নজর করার সময়ে। সচরাচর ওরা দুলকি চালে দৌড়ে চলে ঘণ্টায় ৮/৯ কি.মি. গতিতে, এতে করে ওরা একটানা বহুক্ষণ চলতে পারে বলে অনায়াসে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে থাকে। শিকারকে ধাওয়া করার সময়ে সমতল জমিতে নেকড়ে ঘণ্টায় ৫০-৭০ কি.মি. গতিতে ছুটতে পারে, আর এই গতি ধরে রাখতে পারে অন্তত ২০ মিনিট । এক লাফে ১৫/১৬ ফুট পার করতে পারে।

পাঁশুটে নেকড়েরা সবসময়েই যে দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে তা নয়। বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের নেকড়ে অনেক ক্ষেত্রেই একলা বিচরণ করে। দলবদ্ধ থাকলেও তারা দলে তেমন ভারী নয়। আগের চেয়ে তাদের সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই দলও ছোট হয়েছে। এর একটা বড় কারণ হল, ভারতীয় উপমহাদেশে জনবিস্ফোরণের কারণে নেকড়ের বিচরণভূমি অনেক সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। নেকড়ে ঘন জঙ্গলের চেয়ে ঝোপঝাড়, মেঠো, রুক্ষ বনভূমিই পছন্দ করে। তার কারণ সে ধাওয়া করে তার শিকারকে বাগে আনে, আর তার জন্য এই ধরনের খোলা জমিই প্রশস্ত। নেকড়ের বন্য শিকার — কৃষ্ণসার, চিঙ্কারা, নীলগাই (এগুলি ভারতীয় অ্যান্টিলোপ), বুনো শুয়োর ইত্যাদির চারণভূমি চাষের খেতে পরিণত হওয়ায় তাদের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে, চিঙ্কারা তো ভীষণই কমে গেছে। কমে গেছে বটের জাতীয় পাখি, ময়ূর, যারা খোলা জমিতে থাকে এবং নেকড়ের স্বাভাবিক শিকার, তাদের

সংখ্যাও। শিকার প্রাণী হ্রাস পাওয়ায় নেকড়ের খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। তারা ছাগল, ভেড়া, এমনকি সাপ, গিরগিটি, মেঠো ইঁদুর ইত্যাদি ছোট শিকার ধরতে বাধ্য হচ্ছে। খরগোশ তো তাদের খাদ্যতালিকায় বরাবরই ছিল। আগেও নেকড়ে সুযোগ পেলে এসব শিকার করত, কিন্তু বড় শিকার না পেলে দলের সবার কুলোবে কেন? ফলে দল ছোট হচ্ছে, নেকড়েরা, বিশেষত মদ্দারা অনেকেই একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেকড়ের দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তির সবকটিই প্রখর হওয়ায় বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবনসংগ্রামে টিকে থাকাটা তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। খোলা জমিতে দৃষ্টিশক্তিই শিকারকে চিহ্নিত করায় প্রধান হাতিয়ার হলেও, অদৃশ্য শিকারকে শব্দ কিংবা গন্ধের সাহায্যে খুঁজে বার করতে নেকড়েরা খুবই দক্ষ। বিশেষত একলা নেকড়ের বেলায় এই দুটি গুণ তার মস্ত সম্বল। গৃহপালিত কুকুরের অলফ্যাক্টরি লোব, অর্থাৎ গন্ধের অনুভূতির স্থানটি, আকারে মানুষের ঐ অঙ্গটির ১৪ গুণ, এবং কুকুরের ঘ্রাণশক্তির কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু নেকড়ের ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও অনেক প্রখর। গ্রে উল্‌ফ দেড় কি.মি. দূর থেকে গন্ধ শুঁকে শিকারকে শনাক্ত করতে পারে বলে পরীক্ষিত।

এতকাল পর্যন্ত ভারতের সমতলের নেকড়েকে গ্রে উল্‌ফেরই (Canis lupus) একটি প্রজাতি বলে ধরা হত এবং ভারতীয় উপমহাদেশের নেকড়ে ও মধ্য এশিয়ার সমতলের ও মধ্যপ্রাচ্যের নেকড়েকে অভিন্ন প্রজাতি (Canis lupus pallipes) বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু অতি সাম্প্রতিক জিনঘটিত গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় নেকড়ের সঙ্গে বিগত ৪ লক্ষ বছরে অন্য কোনও উপপ্রজাতির রক্তের মিশ্রণ ঘটেনি। ফলত এরা একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি রূপে বিবর্তিত হয়েছে। তদনুসারে ভারতীয় নেকড়ের নতুন বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ হয়েছে (Canis indica)। অতঃপর Canis lupus pallipes নামে চিহ্নিত থাকবে ইরান, আফগানিস্তান, আরবদেশ ও ইজ়রায়েলের বাসিন্দা উপপ্রজাতিটি। তবে জীববিদদের একাংশ এখনও এই পৃথকীকরণের ব্যাপারে সন্দিহান।

গ্রে উল্‌ফের দুটি উল্লেখযোগ্য উপপ্রজাতি হল তিব্বতী নেকড়ে (Canis lupus filchneri), যার বাসস্থান চীনের গাংসু, কিংহাই অঞ্চলে এবং তিব্বতের মালভূমিতে। অপরটি মঙ্গোলীয় নেকড়ে (Canis lupus chanco)। শেষোক্ত প্রাণীটির নামকরণ হয়েছে নেকড়ের লাদাখি নাম ‘শাঙ্কু’ থেকে। এই দুটি উপপ্রজাতিকে আগে অভিন্ন মনে করা হত, এবং এখনও বহুক্ষেত্রেই তিব্বতী নেকড়েকে C.l. chanco নামেই উল্লেখ করা হয়। লাদাখ, হিমাচল প্রদেশের লাহুল, স্পিতি, নেপাল, ভূটান, তিব্বতের মালভূমি, চীনের একাংশ এবং মঙ্গোলিয়ায় এরা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। এখানেও নামকরণ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। নেকড়ের লাদাখি নাম “শাঙ্কু” অনুসারে যে প্রাণীটিকে

শনাক্ত করা হয়েছে, ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে তার তিব্বতী নেকড়ে হবার কথা, কেননা মঙ্গোলিয়া এখান থেকে বহুদূরে, চীনের উত্তর সীমায়। তবে উপরোক্ত দুরকম নেকড়েই গ্রে উল্‌ফেরই উপপ্রজাতি বলে স্বীকৃত। কিন্তু বিভ্রান্তির এখানেই শেষ নয়; গ্রে উল্‌ফের থেকে পৃথক আরেকটি প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে হিমালয়ান উল্‌ফ (Canis himalayensis) নামে, যার থেকে তিব্বতী (এবং মঙ্গোলীয়) নেকড়েকে আলাদা করা দুরূহ। কুকুর, শেয়াল, কায়োটির সঙ্গেই যেখানে গ্রে উল্‌ফের রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে, সেখানে জিনগত ভাবে তিব্বতী/মঙ্গোলীয় নেকড়ের তুলনায় প্রায় (?) অভিন্ন হিমালয়ান উল্‌ফ কী করে রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখবে — বিশেষত যে সব স্থানে তাদের বিচরণভূমি অভিন্ন — তা অবশ্যই ভাবার বিষয়। বস্তুত হিমালয়, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনের নেকড়েদের প্রজাতিগত শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি। জীববিদদের অনেকেই এখনো এগুলিকে নিছকই ভৌগোলিক ভাবে পৃথক গোষ্ঠী বলেই ভেবে থাকেন।

তবে তিব্বতী-মঙ্গোলীয়-হিমালয়ের এই নেকড়েরা উপমহাদেশের সমতলের বৃককূলের চেয়ে বড়, তাগড়া ও রোমশ তো বটেই, এদের গায়ের রঙের বৈচিত্রও অনেক বেশি। সার্বিক ভাবে গ্রে উল্‌ফ লিস্ট কনসার্ন্ড তালিকায় উঠে এলেও, পরিবেশের প্রতিকূলতা ও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এশীয় উপপ্রজাতিগুলি কিন্তু এন্ডেঞ্জার্ড বা সঙ্কটাপন্ন তালিকাতেই রয়ে গেছে।

কবিতা

সহর থেকে শহর

শৌভিক গাঙ্গুলী

শেষ দুপুরের বৃষ্টির পর
সোঁদা মেটে গন্ধে মন মেঘলা হল।
সকালে ভেবেছিলাম আগুন খুঁজছি !
রাতে অনুতাপ এসেছিল, আমন্ত্রণ ছিল না তবু
পাঁজরের ভিতর একটা ফিউশন তৈরি করেছে,
জীবিত নাগরিক মাংসপেশিগুলো অদৃশ্য
অক্ষরের মতো, ওরা বিদ্রোহ করে না,
রাস্তা জুড়ে শববাহী শকটে বেগবান
জীবন খেয়াল করে না; কারা খেয়াল করল
তাতেও ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই!
নজর এড়িয়ে বনপলাশির ছায়ায় এসে দাঁড়ালেই শীতলতা;
জ্বরের রাতে, মায়ের শরীর ভেজা গন্ধ।
দাঁড়াতেই চাই; কোথায় জুড়াই?
এসো একটু আদরে, চলকে পড়ুক সোহাগি অক্সিজেন; বেঁচে থাকার
ছায়াবৃত্তে। এই শহরের ভিতরে আর একটা সহর ছিল,
হোগলা ছাউনি চেরা পুঁইমাচা; আম জামরুলের
ছায়াতে লুটোপুটি খাওয়া শৈশব, রান্নাঘর,
নিকানো দাওয়ার খুঁটিতে কস্তুরীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে ছাগ শিশু,
পটুয়ার যত্নে আঁকা ছবির মতো দুপুরের পুকুরে কলরব।
মৈথুনের কাঙ্ক্ষা বুকে কালো হংসীর দল নালিঘাসের
আড়ালে চলে যেত নির্দ্বিধায়। মায়ের মতো কোলে টেনে
নেওয়া রাতে
দৈব নির্দেশ ছাড়াই অভিমানী চাঁদের কপালে চুমু খেত
সুপারি গাছের কালচে সবুজ পাতা।
ক্রমে সহর থেকে শহরের পথে শকুনিরা জটলা করল,
ছিনিয়ে নিল সবুজের আঁচল, খুবলে খেল মধুমাখা বুক,
প্রাণে বাঁচতে গাছের পিঁপড়েরা আশ্রয় নিল মাটির গভীরে,
পাখিরা উড়ে গেল পাহাড়ের ওপারে।
ঈশ্বর বসে আছে হাঁটু মুড়ে, নগ্ন দেবতার থানে ওড়ে ছাই,
প্রকৃতির বুক শূন্য! মানবতার গুপ্ত কুঠুরিতে ফুরিয়ে আসা
মোমবাতির আলোয়,
শহরের প্রতিচ্ছবিতে দোল খাচ্ছে প্রতীক জীবনের মরূদ্যান!
সহর ফুরিয়ে শহর হয়ে ওঠার আগে শুকনো পাতাগুলো
একটা ঘূর্ণিঝড়ের অপেক্ষা করছে, পিঁপড়েকে ভালবাসার
পোশাক পরাবে বলে।

প্রকৃতির বহর

তুষার চক্রবর্তী

প্রকৃতি তো তাই,
যা দেখতে পাই,
নদী, জঙ্গল আর পাহাড়,
গোধূলি, আলো পূর্ণিমার,
না, প্রকৃতি স্বর্গসমান।
প্রকৃতি সেটাই,
শুনতে যা পাই,
শনশনিয়ে হাওয়া বয়,
বাজ পড়ার শব্দ হয়,
প্রকৃতি মানে ঐকতান।

প্রকৃতি বলতে জানি বুঝি,
জ্ঞানের বহরে সোজাসুজি,
পরিধিই সীমায়িত যদি,
প্রকৃতির বোধ তদবধি।

অনুবাদ কবিতা
Nature : Emily Dickinson

মেঘের আঁচল

দীপাঞ্জন বসু

মেঘের আঁচল হয়েছে উদাসী প্রেমিক
আকাশ ঘিরে আঁধার এসেছে নেমে
মন নেচে ওঠে এমন বাদল দিনে
ভালো লাগা যেন ভালবাসা হতে চায়।

মনে পড়ে যায় সেদিনের কত কথা
প্রথম যেদিন..এমনই শ্রাবণদিনে
স্নান করেছিল নিজের অচেনা আঙিনা
আবেগের কোন অজানা অঝোর ধারে,
মৃদঙ্গ কেউ বাজাল মনের গভীরে
চমকিত হল ভীরু বিদ্যুৎ আলোকে
কোথা থেকে যেন বাঁশি উঠেছিল বেজে
ফুটল সেদিন প্রথম কদমফুল
দর্পণে শুধু রয়ে গেল অনুভূতি।

আমার ব্যাচ

ভাস্কর গুপ্ত

স্মৃতির পাতায় মহাকাল প্রতিনিয়ত যা লিখে চলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে। স্কুলজীবন পার হয়ে আসার অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পরে তার পাঠোদ্ধার করা রীতিমতো কষ্টকর। তবুও সময়ে অসময়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো হঠাৎই ভেসে আসে কোনও ছবি, কিছু ঘটনা, কিছু মুখ। সেইসব স্মৃতি কখনও বয়ে আনে কিছু বেদনার অনুভূতি, কখনও নির্মল হাস্যরস অথবা অন্যরকম ভালোলাগা হয়তো বা।

জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশনে আমি পা রেখেছিলাম প্রাথমিক বিভাগ পেরিয়ে। এর আগে আমার পঠনপাঠন ছিল ইংরাজি মাধ্যম একটি মিশনারি স্কুলে। সেখানকার কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার চাপের পরে এই স্কুলের স্বাধীন বাতাস আমাকে যে মুক্তির আনন্দ দিয়েছিল, এত বছর পরেও তার স্বাদটি বেশ মনে আছে। অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল বটে। স্কুলে পা দেওয়ার দু একদিনের মধ্যেই সহপাঠীদের কল্যাণে আমার একটি ডাকনাম জুটে গিয়েছিল। না, মোটেই বলব না সে ডাকনামটি কী, তবে সেই নামে ডাকলে যে প্রচণ্ড রাগ হত সে কথা বেশ মনে আছে। এখন অবশ্য সে কথা মনে পড়লে হাসিই পায়। সেই সব ছেলেমানুষির দিনগুলো কেন যে হারিয়ে যায়! নামকরণ যে একলা আমারই হয়েছিল এমনটা নয় কিন্তু। একজনকে ডাকা হত পান বলে, সে দিব্যি সাড়া দিত সে নামে ডাকলে। আর একজনের নাম ছিল পোনা। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারার একজনকে নাম দেওয়া হয়েছিল ডালডা। তারই আবার দ্বিতীয় একটি নাম দেওয়া হয়েছিল—গীতা। এই নামে ডাকলে প্রায় মারামারির উপক্রম হত। এদের সকলেরই আসল নামগুলো আমার মনে আছে, কিন্তু এখানে তা প্রকাশ করতে চাই না। মনে হয় এদের সঙ্গে আবার দেখা হলে বেশ হত। কে জানে কোথায় আছে তারা! ১৯৯৮ সালে আমার মেয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট রেজাল্ট প্রকাশের দিন ডালডা (গীতা) র সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। খুব মজা হয়েছিল। তার মেয়ে আর আমার মেয়ে একই ক্লাসে পড়ত! আশ্চর্য, এতদিন ধরে আমরা কেউই সেটা জানতাম না।

সহপাঠীদের মধ্যে তখনই প্রায় তারকা হওয়া ছিল কেউ কেউ। যেমন কুণাল। কুণাল মিত্র, সুচিত্রা মিত্রের ছেলে বলে বাড়তি একটা সম্ভ্রম ছিল তার, অন্তত আমার চোখে। সে কিছুদিন পরে আমাদের স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে চলে যায়। বহুদিন পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারেনি। আর একজন ছিল রাজা। রাজা মুখার্জি। সে যদিও অন্য সেকশনে ছিল কিন্তু উঠতি ক্রিকেটার বলে সবাই তাকে বিশেষ নজরে দেখত। সে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিল যে দলে সুনীল গাভাস্কার, একনাথ সোলকারের মতো পরবর্তীকালের বিখ্যাত খেলোয়াড়রা ছিলেন। ওই দল ইংল্যাণ্ডে স্কুল ক্রিকেট টেস্টে জয়ী হয়ে আসার পর

রাজাকে স্কুল থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছিল মনে আছে। কুণাল আমেরিকাবাসী বহুদিন ধরে। আর রাজা? জানিনা সে কোথায় আছে, খেলার জগত থেকে সে কেনই বা মুছে গেল... জানতে ইচ্ছে করে খুব।

আমাদের ব্যাচের হিরো নাম্বার ওয়ান ছিল শেখর। শেখররঞ্জন দাশগুপ্ত। কাঁকুলিয়া কালীবাড়ির কাছে ওদের বাড়িতে গেছি অনেক। তার উদ্দাম প্রেমের যেসব গল্প সে শোনাত তার কতটা সত্যি আর কতটাই বা স্বকপোলকল্পিত তা অবশ্য জানি না। তবে একবার সরস্বতী পুজোর দিন তার সঙ্গে বেরিয়ে একটি মেয়েকে দেখে তার উক্তির ফলে রাস্তার মধ্যে যে বিপাকে পড়তে হয়েছিল সে গল্প বলিনি কাউকে। গৃহিণীর কর্ণগোচর হলে এই বাহাত্তুরে বুড়োর পৃষ্ঠও সম্মার্জনীর আঘাতে জর্জরিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। শেখরের আর একটি কীর্তিও মনে দাগ কেটে গেছে। চৈতন্যবাবু ছিলেন আমাদের ইংরাজির শিক্ষক। সদ্য কাজে যোগ দিয়েছেন তখন। একদিন তাঁকে ধরা হল আমাদের ক্লাস ছুটি দিয়ে দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন পড়াবেন না যদি কেউ গল্প বলতে পারে। শ্রীমান শেখর গল্প বলতে উঠলেন। প্রেমের গল্প। কিন্তু সে প্রেম মোটেই "নিকষিত হেম"নয়। গল্পে আঁশটে গন্ধ যখন প্রবল হয়ে উঠল, চৈতন্যবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "এই ক্লাসে আমার থাকা সম্ভব না"। বেরিয়ে গেলেন তিনি। শেখরের গল্পও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী, গল্পটা আর এগোল না বলে দুঃখ পেয়েছিলাম বেশ। খুব ইচ্ছে করে শেখরের সঙ্গে দেখা হোক। জানি না সে কোথায় আছে। আছে তো?

এমন তো কত সহপাঠী পাড়ি দিয়েছে অন্য জগতে। সোমনাথ দাশগুপ্ত, বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটের কাছের যার বাড়ি ছিল। সেন্ট হ্যালেন বলে একটি স্কুলে পড়াত সে। কবে যেন নেই হয়ে গেল সে। জয়ন্ত গোস্বামী, ডাক্তার, জামির লেনে বাড়ি ছিল তার। নেই সেও। অঞ্জন মুখার্জি। কয়েকদিন আগেই বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। ঘুমের মধ্যে চিরঘুমে ঢলে পড়েছিল সেও। সব থেকে আঘাত পেয়েছিলাম ধ্রুবর মৃত্যুতে। ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত। এত অকস্মাৎ সেই চলে যাওয়া!

জীবন তো তাও থেমে নেই। সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জগদ্বন্ধু রায়ের নাতি সোমনাথ তৈরি করেছে একটি হোয়াটস্যাপ গ্রুপ। সেখানে কথা হয়, সুখ দুঃখের আদানপ্রদান হাসি ঠাট্টা সবই হয়। মাঝে মাঝে আমরা মিলিত হই কখনও কোনও ক্লাবে কখনও কারো বাড়িতে, হৈ চৈ আড্ডায় ফিরে যাই সেই ছাপ্পান্ন বছর আগে ফেলে আসা স্কুলের দিনগুলোতে। স্মৃতির পাতার ধুলোগুলো উড়ে গিয়ে সোনার অক্ষরে লেখা মহাকালের কলমের আঁচড় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

আমাদের খবরাখবর

গত ২৯ মার্চ ২০২৪ সন্ধ্যায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল এবং ২০২৩-২৫ সময়কালের পরিচালন সমিতি গঠিত হল। বার্ষিক সাধারণ সভায় বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তনীদের উপস্থিতি ও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে দীর্ঘ আলোচনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই সভার বিবরণী সময়মতো প্রাক্তনী সদস্যদের ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

নীচে নতুন পরিচালন সমিতি (২০২৩-২৫) প্রকাশিত হল—

সভাপতি	সুকমল ঘোষ	১৯৬৯
সহ সভাপতি	অমিতাভ বিশ্বাস	১৯৮২
সম্পাদক	সন্দীপ চ্যাটার্জি	১৯৮৫
সহ সম্পাদক	সঞ্জয় ব্যানার্জি	১৯৮৬
কোষাধ্যক্ষ	দেবাশিস দাস	২০০০
সদ্য প্রাক্তন সভাপতি	দেবপ্রসন্ন সিংহ	১৯৬৭
সদস্য	দেবদীপ দে	১৯৮৭
সদস্য	ইন্দ্রনীল সরকার	১৯৯৪
সদস্য	কৌশিক চ্যাটার্জি	২০০০
সদস্য	পলাশ পাল	২০০২
সদস্য	পার্থ রায়	১৯৮৭
সদস্য	শান্তনু বসু	১৯৮৭
সদস্য	শান্তনু চ্যাটার্জি	১৯৮৩
সদস্য	সৌভিক ঘোষাল	২০০২